বিজ্ঞাপন।

সাহিত্যসার প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাঙ্গালা গদ্যের প্রারম্ভ হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রকার রচনা প্রণালীর উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর অতীত হইল বাঙ্গালা গদ্যের লিখিত প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কত দিন পূর্ব্বে [illegible] গদ্যের প্রথম সম্ভব হয়, তাহার স্থির নিশ্চয় নাই। তবে যত দূর অনুমান করিতে পারা যায় [illegible] এই মাত্র প্রতীয়মান হয় যে বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি অবধি ইহার গদ্যের প্রসূ- [illegible] হয়। কিন্তু ইহার লিখিত প্রচার কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে এক [illegible] অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন রচনা প্রণালীর উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল গদ্য প্রবন্ধের মধ্যে যে গুলি সহজ সুন্দর ও বালক-বালিকা- [illegible] পাঠোপযোগী বোধ হইয়াছে সেই গুলিই উদ্ধৃত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সংগ্রহ গ্রন্থ আছে কি? যে দুই এক খানি আছে তাহাতে রীতিমত প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ রচনার উদাহরণ নাই। কিন্তু এরূপ না হইলে সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বলিতে পারা যায় না। একাধারে সকল প্রকার রচনার উদাহরণ প্রদত্ত না হইলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাঠ করাই বিধেয়। আমি এই উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি।

কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত করাইবার অভিপ্রায়ে ইহার উপক্রমণিকাবিভাগে এই বিষয়ের পুরাবৃত্ত ঘটিত একটী সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব রচনা করিয়া দিয়াছি। এটী পাঠ করিলে সুকুমারমতি বালকবালিকারা বাঙ্গালা ভাষার পুরাবৃত্ত বিষয়ে এক প্রকার অবগত হইতে পারিবে। প্রাচীনতম রচনা গুলি অপেক্ষাকৃত কঠিন, অতএব শিক্ষক মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে ঐ অংশ শেষে পড়াইতে পারেন।

পরিশেষে যে সকল লেখকদিগের রচনা হইতে আমি উদ্ধৃত করিয়াছি তাঁহাদিগের নিকট আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদিগের প্রতি আমার অগণ্য ধন্যবাদ। ইতি

৯ই জানুয়ারি }
১৮৭৫

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

সাহিত্যসার দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল। এবারে ইহা সবিশেষ যত্ন-সহকারে সংশোধন করিয়াছি। দুই একটী বিষয় অপেক্ষাকৃত কঠিন ও অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে উহাদের পরিবর্ত্তে কয়েকটী নূতন ও আবশ্যক বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতি ১ লা এপ্রেল ১৮৭৭

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র শর্ম্মা।

সাহিত্যসার।

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাঙ্গালাদেশের প্রাকৃতিক সীমাচতুষ্টয়ের অন্তবর্ত্তী জনপদসমূহের অধিবাসীরা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাহারই নাম বাঙ্গালা ভাষা। "বঙ্গ" এই সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশে "বাঙ্গালা" এই শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাদ্বারা আপাততঃ এরূপ সংস্কার হইতে পারে, যে "বঙ্গ" এই দেশবাচক নামটী যত কালের, বঙ্গদেশপ্রচলিত আধুনিক ভাষাও তদ্রূপ প্রাচীন হইবে। বস্তুতঃ এরূপ সংস্কার ভ্রান্তিমূলক। বঙ্গদেশ এই নামটী বহু-কাল অবধি বিদ্যমান আছে। প্রায় দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থাদিতেও বঙ্গদেশের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়. কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা তদপেক্ষা অনেক আধুনিক। কত দিন পূর্ব্বে ও কি প্রকারে এই

কাহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার প্রকৃত উপায় কিছুই নাই। তবে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু নির্দ্দেশ করা যায়, সমুদয়ই অনুমানমূলক। অনেকে অনুমান করেন, যে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষর উভয়ই এক সময়েই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। একথা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়াই প্রতীতি হয়। আমাদের অনেকানেক তন্ত্রশাস্ত্রে বাঙ্গালা বর্ণমালার সবিস্তর বর্ণনা আছে। কতকগুলি তন্ত্র নিতান্ত আধুনিক বটে, কিন্তু অপর কতকগুলি ৭। ৮ শত বৎসর পূর্ব্বের রচিত, এবং ঐ সকল তন্ত্রেও বাঙ্গালা অক্ষরের উল্লেখ আছে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা যে অন্ততঃ ৭। ৮ শত বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এক প্রকার নির্ব্বিবাদে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি গৌড়ীয় রাজারা এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের প্রদত্ত দান ও অনুশাসনপত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎসমুদায় দেবনাগর ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অক্ষরে লিখিত। এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, যে উহঁাদের সময়ে অর্থাৎ এখন হইতে এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষরের সূত্রপাত হইয়া থাকিবে।

বাঙ্গালা একটী স্বতন্ত্র ভাষা, না অন্য কোন ভাষার অপভ্রংশে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এ বিষয়ের

মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। বাঙ্গালা একটী স্বতঃসিদ্ধ ভাষা নহে, ইহা সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ সংস্কৃতই যবনভাষাব্যতীত ভারতবর্ষ প্রচলিত অন্যান্য সমস্ত ভাষারই মূল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, উড়িয়া প্রভৃতি আধুনিক ভাষা সকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন নহে। সংস্কৃত ভাষা কোন কালেই আপামর সাধারণ সকলেরই কথাবার্ত্তা কহিবার ভাষা ছিল না। পণ্ডিত ও উচ্চতর শ্রেণীস্থ লোকেরাই সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিতেন। স্ত্রীলোক ও আপামর সাধারণ সকল লোকে সংস্কৃতানুযায়ী অপর একটী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। ঐ সর্ব্বসাধারণ ভাষার নাম প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষাও সংস্কৃতেরই অপভ্রংশে উৎপন্ন। প্রাকৃত ভাষাও বহুকালের প্রাচীন ভাষা। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেও ইহা প্রচলিত ভাষার আকারে ছিল। সেই ভাষারই সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়, ও তাহার কিছুকাল পরে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ প্রাকৃত ভাষার সৃজন হয়। এই প্রাকৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া, প্রভৃতি সমস্ত অধুনাতন ভাষার এত দূর ঘনিষ্ঠতা লক্ষিত হয় যে প্রাকৃত ভাষা হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সমস্ত ভাষার উৎপত্তি ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয়। বাঙ্গালার বর্ণমালাও দেবনাগরের রূপান্তরমাত্র। বাঙ্গালা ভাষার

এরূপ কথা অনেক আছে যাহা সংস্কৃত বা প্রাকৃত [illegible] ভাষা হইতে উৎপন্ন নহে। "খুচরা" [illegible] "[illegible]" প্রভৃতি বাক্য ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাকৃত ভাষা ও তৎকালপ্রচলিত পার্বতীয় [illegible]নিবাসীদিগের কোনপ্রকার ভাষা এই উভয়ের পরস্পর সংস্রবে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। মুসলমানদিগের বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিবার পর বাঙ্গালাভা[illegible] [illegible]কাল। সুতরাং মুসলমানদিগের [illegible] হইতেও অনেকানেক কথা বাঙ্গালাভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। "দপ্তর" "জমি" "আইন" প্রভৃতি বাক্য মুসলমানদিগের ভাষা হইতে গৃহীত। একালে ইংরাজশাসনের অধীনে "চেয়ার" "গেলাস" "বাক্স" প্রভৃতি [illegible] ইংরাজী শব্দও ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টিসাধন করিতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, প্রাকৃত হইতে হিন্দী ও হিন্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বলেন, যে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতেন তাহাতে হিন্দীর ভাগ অধিকাংশ, কিন্তু ইহা দ্বারা কখনই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, যে বাঙ্গালা ভাষা হিন্দী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন গ্রন্থকার বহুলপরিমাণে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের সম-

কালীন অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তারা আবার হিন্দী শব্দ অতি অল্প মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে তৎকালে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখিতে হইলে অধিক পরিমাণে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করাই রীতি ছিল। কারণ এরূপ গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন বিভিন্নবিষয়ক গ্রন্থেই হিন্দীর তাদৃশ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা ও হিন্দী এই উভয়ের ব্যাকরণাদিগত বিভিন্নতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও আমাদেরই অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

বাঙ্গালাভাষার তিন কাল বা অবস্থা।

বাঙ্গালার উৎপত্তি কাল অবধি অধুনাতন কালপর্য্যন্ত সমস্ত কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তদনুসারে ইহার শৈশব, বাল্য ও প্রৌঢ় অবস্থার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালাভাষার প্রথম সংঘটন হইতে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৮৫ পর্য্যন্ত আদ্যকাল। চৈতন্যের সময় হইতে ভারতচন্দ্র রায়ের পূর্ব্ব অর্থাৎ ইং ১৭৫২ অব্দ পর্য্যন্ত সমুদয় কাল মধ্যকাল। আর ভারতচন্দ্রের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সময়কে ইদানীন্তন কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নিম্নে এই তিন কালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

আদিমকাল।

আদিমকালে বাঙ্গালাভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল বিশেষ জানিবার উপায় নাই। তৎকালের দুইজন গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থ ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থ পাওয়া যায় না। সকল ভাষারই নিয়ম এই, গদ্য রচনার পূর্ব্বে পদ্য রচিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক, প্রভৃতি ভাষাতেই এই নিয়ম। বাঙ্গালাভাষাও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে। এক্ষণে আদ্যকালের যে দুই একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই পদ্যে রচিত। গদ্যরচনা না দেখিতে পাইলে কোন ভাষারই বিশেষ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। কারণ গদ্যরচনায় ভাষার প্রকৃতি যেরূপ বিবৃত হয়, পদ্যরচনায় তাহা হয় না। পদ্যরচনা সম্পূর্ণ-রূপে ভাষাবিষয়ক নিয়মসমূহের অনুসরণ করে না, বরং অনেক স্থলেই উহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আদ্যকালের বাঙ্গালার প্রকৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবার উপায় নাই। কারণ তৎকালীন যে কয়-খানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সমুদয়ই পদ্যে রচিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বাঙ্গালাভাষায় পুরুষপরীক্ষা নামে যে গ্রন্থখানি প্রচলিত আছে উহা বাঙ্গালার আদিকবি বিদ্যাপতির রচনা। কিন্তু পুরুষপরী-ক্ষার ভাষা দেখিলে কখনই এরূপ অনুমান হইতে পারে না। পরন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি,

যে বিদ্যাপতি সংস্কৃতভাষায় পুরুষপরীক্ষা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এখনকার প্রচলিত বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা ঐ সংস্কৃত গ্রন্থেরই অনুবাদ। বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যক্ষগণের নিয়োগানুসারে হরপ্রসাদ রায় নামক কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়।* এতাবতা অনুমান হইতেছে যে আদিমকালে বাঙ্গালাগদ্যে বোধ হয় কোন গ্রন্থই রচিত হয় নাই। তৎকালের লোকে বাঙ্গালা গদ্যে কথাবার্ত্তা কহিত এই মাত্র।

আদিমকালের রচনার মধ্যে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও চণ্ডী-দাস এই উভয়ের প্রণীত কতকগুলি পদাবলী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রায় এক সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে কোন স্থানে ইহাঁদের জন্ম হয়। চৈতন্যদেবের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁরা বর্ত্তমান ছিলেন।

আদিমকালের ভাষা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করা সহজ নহে, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনাদৃষ্টে এই পর্য্যন্ত বোধ হয়, যে তৎ-কালীন বাঙ্গালা অধুনাতন বাঙ্গালা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন ছিল। তৎকালে এখন অপেক্ষা অনেক অধিক পরি-মাণে হিন্দীশব্দ ভাষার অন্তর্ভূত ছিল। সে সময়ে বাঙ্গালার

* কালকাত্তা রিভিউ ১৩ ভলম, ১৮০ পৃষ্ঠা।

মধ্যকাল।

চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র রায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাবৎকাল মধ্যকাল বলিয়া পরিগণিত। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়া ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে লোকান্তর গমন করেন। নবদ্বীপ চৈতন্যদেবের জন্মস্থান। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা। ইনি সংসারবিরাগী হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক দেশে দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। চৈতন্যদেব জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। ইহাঁর মৃত্যুর পর ইহাঁর শিষ্যগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন। ইহারা চৈতন্য প্রভুর জীবনবৃত্ত অবলম্বনপূর্ব্বক বাঙ্গালাভাষায় অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ফলতঃ চৈতন্যদেবের শিষ্য ও অনুশিষ্যদিগের নিকট বাঙ্গালাভাষা অনেকাংশে ঋণী, এমন কি অনেকে এই সময়কেই বাঙ্গালাভাষার প্রকৃত আদিকাল অর্থাৎ উৎপত্তির কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উল্লিখিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে তিন জন প্রধান গ্রন্থকার ছিলেন। জীবগোস্বামিপ্রণীত কড়চা, বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজবিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত এই তিন খানিই অদ্যাপি বৈষ্ণবভক্তের পরমারাধ্য গ্রন্থ। চৈতন্যের মৃত্যুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অনুমান ইং ১৫৭৩ অব্দের মধ্যে উক্ত গ্রন্থসকল রচিত হয়। উল্লিখিত ও অন্যান্য তাবৎ বৈষ্ণব গ্রন্থই চৈতন্যদেবের

সময়ের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। চণ্ডীর ভাষা ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও কৃত্তিবাসের রচনার ন্যায় প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য নহে। উহার অনেক স্থলে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ও বাঙ্গালা অপভ্রংশশব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক কবিকঙ্কণ চণ্ডী যে বঙ্গালাভাষার একখানি প্রধান প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা পাঠ করিলে তাৎকালিন লোকের রীতি নীতি আচার ব্যবহারের বিষয় অনেক জানিতে পারা যায়। চণ্ডীরচনার কিছুকাল পরেই ক্ষেমানন্দনামক কোন কবি মনসার ভাসান নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ অদ্যাপি সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। ক্ষেমানন্দের পরেই কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করেন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণীনামক পরগণায় কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃত্তিবাস প্রভৃতির ন্যায় ইঁহারও প্রকৃত সময় নিরূপণ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় তিনি এখন হইতে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাশীরাম একজন প্রকৃত কবি ছিলেন, তিনি আপন গ্রন্থে তাঁহার কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। মহাভারতের ভাষা রামায়ণ ও চণ্ডীর ভাষা অপেক্ষা অনেকাংশে মার্জ্জিত। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, কাশীরামের

সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষার অপেক্ষাকৃত অধিক অনুশীলন আরম্ভ হয়। কাশীদাসের প্রায় ৮০ বৎসর পরে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক এক জন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শিবসঙ্কীর্ত্তন নামক শিবলীলা-বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন, ইঁহার পর রামপ্রসাদ সেন প্রাদুর্ভূত হন। শিব-সঙ্কীর্ত্তনরচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কবিরঞ্জন রাম-প্রসাদ সেন [illegible] সময়েরই লোক ছিলেন। তবে রামে-শ্বর রামপ্রসাদ অপেক্ষা অধিকবয়স্ক ছিলেন। হালিসহর গ্রামে বৈদ্যকুলে রামপ্রসাদের জন্ম হয়। রামপ্রসাদ [illegible] সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন [illegible] চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। [illegible] হইবার পর কলিকাতাবাসী কোন ধনীর ভবনে মুহুরিগিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তিনি বিষয়কর্ম্মে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না। তাঁহার মন নিরন্তর পরমার্থচিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিত। দৈবক্রমে তাঁহার প্রভু তাঁহার মনের ভাব ও কবিত্বশক্তির পরিচয় [illegible] তাঁহাকে মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিস্বরূপে দান করিতে [illegible] করিয়া অনুক্ষণ অভীষ্ট পরমার্থ চিন্তায় মনো-নিবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার পর রামপ্রসাদ [illegible] পুস্তক রচনায় ব্যাপৃত থাকিয়াই জীবন অতিবাহিত [illegible] কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তিতে [illegible] কবিরঞ্জন উপাধি ও ১০০ বিঘা

নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। রামপ্রসাদ সেনের অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ সেনের সময় পর্য্যন্ত তাবৎকাল মধ্যকাল বলিয়া পরিগণিত। আদিকাল অপেক্ষা মধ্যকালের ভাষা অনেক মার্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যকালেও পদ্যাতিরিক্ত গদ্যগ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাষার প্রকৃত অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ত্রিপুরার রাজাবলী ও রামরাম বসুর প্রণীত প্রতাপাদিত্যচরিত এই দুইখানি গদ্যগ্রন্থ মধ্যকালেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কোথাও উহার একখানিও পাওয়া যায় না। তবে মধ্যকালে যে গদ্যগ্রন্থ লিখিবার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরে ক্রমশঃ গদ্যের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা জন্মে ও ইদানীন্তনকালে ক্রমশঃ ইহার নানা উন্নতি হইয়াছে। ফলে পদ্যরচনাবিষয়ে আদিকাল ও মধ্যকাল এই উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এই কালে পূর্ব্বাপেক্ষা ছন্দের অনেক উন্নতি হয়। মধ্যকালের রচনাপ্রণালী ও ভাষা কিরূপ তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

ভেরেণ্ডার খুঁটী তার আছে মধ্যঘরে,
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।
বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা,
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ,
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন।
বৈশাখ হইল বিষ, বৈশাখ হইল [illegible]
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

"কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কর হেলন,
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন।
দেখি দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা,
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।"

কাশীদাস মহাভারত।

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে
উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান, নাহি খায়
ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা ধরে
দে উহারে।

কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে তাহা
সহিতে কি পারে॥

রামপ্রসাদ সেনের কালীকীর্ত্তন।

ইদানীন্তন কাল।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত ইদানীন্তন কাল। এই কালেই বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। যদিও বাঙ্গালা ভাষা ইহার অনেককাল পূর্ব্ব অবধি কথোপকথনের ভাষা ছিল, তথাপি বাঙ্গালা গদ্যরচনার প্রতি লোকের আদর আদৌ ছিল না। সুতরাং এতদিন ভাষার উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্রের পর হইতে বাঙ্গালা গদ্য রচনার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে ইংরাজ মিসনরী ও দেশীয় মহাপুরুষগণের যত্নে বাঙ্গালা গদ্যে অনেকানেক পুস্তক ও পত্রিকা প্রচারিত হয়। এই সময়েই বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সর্ব্বপ্রথম লিখিত হয়। রাজা রামমোহন রায় ও শ্রীরামপুরের মিসনরীগণ সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। কিন্তু বাঙ্গালাভাষার প্রকৃত সংস্কার অতি অল্পদিন হইয়াছে বলিতে হইবে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এইসংস্কা-

রের প্রবর্ত্তয়িতা। ইহাঁর পূর্ব্বে বাঙ্গালাগদ্য অতি জঘন্য কদর্য্য অবস্থায় ছিল, ইনিই উহার প্রকৃত সংস্কার করিয়া উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে বাঙ্গালাভাষার যে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে তজ্জন্য বিদ্যাসাগরকে অগ্রণী ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। বিদ্যাসাগরের পরেই অক্ষয়কুমার দত্ত, রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকানেক মহাত্মা বাঙ্গালাভাষার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন ও অদ্যাপি করিতেছেন। ফলতঃ এক্ষণে আমাদের ভাষা যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় ভবিষ্যতে ইহা প্রকৃতরূপে উজ্জ্বল ও উন্নত হইয়া দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই ইদানীন্তন কালের আরম্ভ। কবিবর ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ সেনের সমকালেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভূরসুট পরগণার মধ্যে পেঁড়ো নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ব্রাহ্মণকুলে মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভারত বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারসী ভাষা অধ্যয়নপূর্ব্বক উহাতে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। হুগলীতে মুন্সীবাবুদিগের বাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক পারসীভাষা অধ্যয়নকালে ইনি ত্রিপদীছন্দে

মনোহর, তাঁহার কবিত্বশক্তি ও বিলক্ষণ ছিল। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইনি নানাবিধ নূতন ছন্দ বাঙ্গালায় প্রণয়ন করিয়াছেন। নিম্নে ভারতচন্দ্রের লেখার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
বুঝহ ঈশ্বরি! আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
সকলের পতি তেঁই পতি মোর বাম।"

শিবের কপাল রয়ে, প্রভুরে আহুতি দহে
না জানি বাড়িল কি কি গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।
অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন পথে পতি যান,
আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে,
হৃদে পতি লহরে বহিয়া।"

ইত্যাদি।

অন্নদামঙ্গলের অব্যবহিত পরেই উলাগ্রামনিবাসী দুর্গা-দাস মুখোপাধ্যায় গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গার পৃথিবীতে আনয়ন সবিস্তরে বর্ণিত আছে। যদিও গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী গ্রন্থে উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির কিছুমাত্র পরিচয় নাই, তথাপি উহা সংসারে ভাগ্যবান প্রভৃতির স্থানে আদরে পঠিত ও [illegible] হইয়া থাকে। দুর্গাদাস এখন [illegible] প্রায় এবং [illegible] পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

যৎকালে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রচারিত হয়, [illegible] ইংরাজেরা বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ভার [illegible] গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে তাঁহাদের বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই [illegible] উক্ত ইংরাজ মহাপুরুষদিগের [illegible] আমাদের [illegible] সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে। এই সময়কেই বাঙ্গালা গদ্য-রচনার আদিকাল বলিয়া নির্দেশ করিতে ও করা যাইতে পারে।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে পণ্ডিতবর হালহেড সাহেব সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালাভাষার একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। হালহেড ও উইল্‌কিন্স এই দুই মহোদয়ের প্রযত্নে ঐ সময়েই শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই কর্ণওয়ার সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক সংগৃহীত আইন সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন, ও

বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্বপ্রথমে অভিধান প্রস্তুত করেন। ইহার পর কিছু দিন বিলম্বে মার্শমান, কেরী প্রভৃতি মিসনরী মহোদয়গণ খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার করিবার উদ্দেশে অনেকানেক বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ সংস্থাপিত হয়। ঐ সময় ঐ বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থে কয়েক জন সাহেব ও বাঙ্গালী মহোদয় কর্তৃক কয়েক খানি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হয়। ঐ সকল পুস্তকসমূহের মধ্যে পুরুষপরীক্ষা ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত প্রবোধচন্দ্রিকা এই দুইখানি গ্রন্থ সর্ব্বপ্রধান। এই সকল গ্রন্থে যদিও নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত আছে, যথার্থ বটে, কিন্তু ইহাদের ভাষা ও রচনাপ্রণালী কোন মতে রুচিকর নহে। প্রবোধচন্দ্রিকার রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় উৎকলদেশীয় লোক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার লিখিত বাঙ্গালাকে কিরূপে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলা যাইতে পারে? ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে প্রবোধচন্দ্রিকা প্রথম মুদ্রিত হয়। এই সময়েই মার্শমান প্রভৃতি মহোদয়দিগের চেষ্টায় বাঙ্গালাভাষায় সাময়িক পুস্তক ও পত্রিকা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি বেঙ্গলগেজেট নামে এক সাময়িক পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি পুস্তক সকল চিত্রের সহিত মুদ্রিত হইত। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে মার্শমান সাহেব

শ্রীরামপুর হইতে দিগ্‌দর্শন নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহাতে শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ের সমাবেশ থাকিত। কিন্তু দিগ্‌দর্শন প্রথম খণ্ডের পর আর প্রকাশিত হয় নাই। ঐ বৎসরেই মার্সমান সাহেব সমাচারদর্পণ নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করেন। এই পত্র ১৮৪১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ১৮২২ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাচার চন্দ্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সংবাদ প্রভাকর প্রচারিত হয়। ১৮৩১ অব্দে গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সংবাদভাস্কর প্রচার করেন। এই কয়খানি পত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কোনখানিরই সেরূপ প্রভাব নাই।

১৮২৮ হইতে ১৮৩৩ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাম বসু, হরুঠাকুর, রামনিধি গুপ্ত প্রভৃতি অনেক মহাত্মা কবিওয়ালার গান রচনা করেন। এই সকল গীতাদিদ্বারা অনেকাংশে বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন হয়, সুতরাং বাঙ্গালাভাষা ইঁহাদের নিকটও যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। উইলিয়ম কেরি, মার্সম্যান প্রভৃতি ইংরাজ মহাপুরুষদিগের সমসময়েই মহাত্মা রামমোহন রায় প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি বাঙ্গালাদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের উদ্দেশে এত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার নাম আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সাদরে স্মরণ করিয়া থাকে।

ইনি খৃঃ ১৭৭৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩৩ অব্দে মানব-লীলাসম্বরণ করেন। এই কালের মধ্যে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মস্থাপন, সহমরণনিবারণ প্রভৃতি নানাবিধ কল্যাণকর কার্য্য করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত প্রায় তাবৎ গ্রন্থই ধর্ম্মঘটিত। অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ইঁহার রচিত একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের পর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বৈদ্য-কুলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম হয়। বাল্যাবস্থা হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কবিতা রচনাবিষয়ে তাঁহার কিছু স্বতঃসিদ্ধ ক্ষমতা ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি বাল্যকালে রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়া কৃতবিদ্য ও মার্জ্জিতবুদ্ধি হইতে পারেন নাই, তথাপি কবিতারচনাবিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল। ইং ১৮৩০ অব্দে তিনি সংবাদ প্রভাকর নামে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। উহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়ই লিখিত হইত। প্রভাকরই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রকাশ হয়। ইনি প্রভাকর ভিন্ন প্রবোধ-প্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইং ১৮৫৮ অব্দে ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ঈশ্বর-

চন্দ্রের রচনাপ্রণালী নিতান্ত প্রাঞ্জল ও বিশদ। তিনি অনেকানেক নীতিগর্ভ বিষয় রচনা করিয়া বাঙ্গালাভাষার অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময়েই সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইংরাজী ১৮১৫ অব্দে নদিয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সম্যক্ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। মদনমোহন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহাধ্যায়ী। পাঠদশাতেই ইনি বাসবদত্তা নামক বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থের রচনা করিয়া স্বীয় কবিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৪৭খৃঃ অব্দে মদনমোহন সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যাধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সুপ্রসিদ্ধ বেথুন সাহেব যৎকালে কলিকাতায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন মদনমোহনই তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময় মদন নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্পাদন করিবার উদ্দেশে বাঙ্গালাভাষায় একখানি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধ খানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। ইং ১৮৫০ অব্দে তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত হয়েন। কিছু দিন এই কর্ম্ম করিবার পর তিনি উক্ত জেলাতেই জজ-

জম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হওন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ওলাউঠা-রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। মদনমোহন বাসবদত্তা ও রস-তরঙ্গিণী এই দুই খানি কাব্যগ্রন্থ ও শিশুদিগের শিক্ষার্থ ৩ ভাগ শিশুশিক্ষা রচনা করেন। শিশুশিক্ষার পূর্ব্বে সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী কোন ক্ষুদ্র গ্রন্থই ছিল না। মদনমোহন শিশুশিক্ষা রচনা করিয়া এই অভাব নিরাকরণ করেন। ফলতঃ এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার যে এতদূর উন্নতি হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ইঁহারা উভয়েই তাহার সূত্রপাত করেন।

মদনমোহনের পর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহু-সংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত সংস্কার করিয়াছেন। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ লক্ষিত হই-তেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার প্রবর্ত্তয়িতা। বিদ্যা-সাগরের ন্যায় অসীমক্ষমতাশালী লেখক অতি বিরল। ফলতঃ ইঁহাকে অধুনাতন বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা বলি-লেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার পর অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণ, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, নীলমণি মুখোপাধ্যায়,

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকানেক মহাত্মারা প্রাদুর্ভূত হইয়া, বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বোধ হয় উক্ত ও অন্যান্য মহাত্মাগণ অবিরত চেষ্টা করিলে ইহা অতি অল্পকালের মধ্যেই একটী প্রধান ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিবে। উল্লিখিত মহাত্মাদিগের মধ্যে দুই একজন ভিন্ন সকলেই বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ শোভা পাইতেছেন। ইঁহাদের একজনেরই নিকট বাঙ্গালা ভাষা যে কতদূর ঋণী তাহার ইয়ত্তা নাই। সে যাহা হউক ইঁহারা অদ্যাপি জীবিত, সুতরাং ইঁহাদের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। অতএব ইঁহাদের রচনার সমালোচন করাও তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল কারণে ইঁহাদের বিষয় সবিস্তরে উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম, তবে আবশ্যকমত স্থানে স্থানে কিছু কিছু বলা যাইবে এই মাত্র।

সাহিত্যসার।

পুরুষ পরীক্ষা—হরপ্রসাদ রায়।

সুবুদ্ধিকথা।

যে পুরুষের মেধা এবং প্রতিভা ও বুদ্ধি এই সকল প্রকৃষ্টা হয় এবং যিনি সন্দেহভঞ্জনক্ষম হন তিনিই সুবুদ্ধি রূপে খ্যাত হন। তাহার উদাহরণ।

মিথিলা নগরীতে কর্ণাটকুলসম্ভব হরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সভাতে সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা এবং দণ্ডনীতিশাস্ত্রে কুশল গণেশ্বরনামা এক মন্ত্রী ছিলেন। দেবগিরির রাজা রামদেব ঐ মন্ত্রীর নানা প্রকার সুবুদ্ধিতা শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া চিন্তা করিলেন, যে কি হেতু ভূমিনিবাসী গণেশ্বরের বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি শুনিতে পাই, তাল সকল নিরূপণ করিতেছি। ইহা ভাবিয়া রামদেব নরপতি হরসিংহ রাজার সহিত মিত্রতা করিলেন, যে হেতুক যাঁহাদের ক্রিয়ার স্থিরতা থাকে এবং যাঁহারা শূর ও মহাত্মা হন, তাহাদিগের যে পরস্পর প্রীতি সে কল্পলতার ন্যায় আচরণ করে। অপর, কোষ এবং সৈন্য নষ্ট হইলে আর ভৃত্য বিকার প্রাপ্ত হইলে ও যদি সদ্বংশজাত লোকের সহিত মিত্রতা থাকে, তবে সেই মিত্রতা কল্পবৃক্ষের মত ব্যবহার করে অর্থাৎ মিত্রের অভিলষিতফলপ্রদ হয়।

অনন্তর উভয় পক্ষের উপঢৌকনদ্বারা সৌহৃদ্য হইলে রাজা রামদেব হরসিংহরাজার নিকটে লিখন দ্বারা এই প্রার্থনা করিলেন, যে সন্দর্শনার্থ এক বুদ্ধিমান এবং মূর্খ এই দুই লোককে আমার নিকটে পাঠাইবেন। হরসিংহ রাজা সেই লিখন দেখিয়া পাঠ করিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন, যে হেতুক মিত্রের বাক্য অন্যথা. সম্প্রতি কোন বুদ্ধিমানকে এবং কোন মূর্খকে পাঠাইব। এতদ্রূপ চিন্তাব্যাকুল রাজাকে দেখিয়া গণেশ্বর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! তোমার কি চিন্তা? রাজা উত্তর করিলেন, মিত্রের আজ্ঞা নির্বাহের অসঙ্গতি দেখিয়া লজ্জা হইতেছে, কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষকে ও কোন মূর্খ লোককে পাঠাইতে হই-বেক ইহা চিন্তা করিতেছি, মন্ত্রী কহিলেন, হে মহারাজ! কোন দুই লোক পাঠাইতে হইবে না। রাজা কহিলেন আর মিত্রের প্রার্থনা কি ভঙ্গ হইবেক। মন্ত্রিরাজ কহিলেন হে মহারাজ! তোমার মিত্রের প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে যে হেতুক [illegible] তাহার সর্বশীরি রাজ্যেতে কি [illegible] কামশ্রী অনেক পণ্ডিত আছেন অনেক মূর্খও আছে, সেই হেতুক এখান হইতে পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ লোককে পাঠাইলে তাহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, আমি এই বিতর্ক করি যে রামদেব রাজা পণ্ডিত এবং অতিশয় কৌতুকী, ঐ প্রকার দুই পুরুষ যাচ্ঞাচ্ছলে তোমার মন্ত্রী যে আমি আমার এই পরীক্ষা করিবেন যে, আমি পণ্ডিত কে আর মূর্খ কে জানিতে পারি কি না। অতএব হে মহারাজ। আপনি এই উত্তর লিখিবেন যে বুদ্ধিমান লোক এ রাজ্যে নাই,

এবং তোমার অধিকার মধ্যেও দেখি না, বারাণসী, এবং অন্য অন্য পুণ্যতীর্থে বুদ্ধিমানের অনুসন্ধান করিবেন। উত্তম বুদ্ধির ফল এই যে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয়, অতএব ইন্দ্রজাল সদৃশ যে সাংসারিক ব্যাপার তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোক কি নিমিত্ত অবস্থিতি করিবেন, তিনি কোন নির্জন স্থানে আর গিরিগহ্বরে যোগাবলম্বন করিয়া থাকিবেন, তদ্ভিন্ন যে মূর্খ লোক সে সর্ব্বত্র সুলভ, সেই জনস্যুর প্রেরণের কল, অতএব তাহার পরিচায়ক চিহ্ন লিখিতেছি, ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত সকল মনুষ্যের হস্তপদাদি সমান হয়, ইহাতে যে ব্যক্তি সকল লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত হয় সেই মূর্খ, অপর, মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে লোক পুণ্যসঞ্চয় না করে এবং যশঃ উপার্জ্জন না করে তাহাকেই মূর্খ কহা যায়। রাজা হরসিংহ এই কথা শুনিয়া কহিলেন তাহাই কর। গণেশ্বর মন্ত্রী ঐ পরামর্শপূর্ব্বক রামদেব রাজাকে সেইরূপ উত্তর লিখিলেন। রাজা রামদেব সেই পত্র পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভাসদ্ সমাজের মধ্যে হরসিংহ রাজাকে এবং গণেশ্বর মন্ত্রীকে এই রূপ অনেক প্রশংসা করিলেন, সাধু রাজা সাধু, যে রাজার রাজনীতিরূপা যে নদী তাহার কর্ণধারস্বরূপ এবং ধর্ম্মজ্ঞ এই গণেশ্বর মন্ত্রী আছেন। সেই কালে রাজা রামদেব এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। যেমত পণ্ডিতেরা গণেশের গুণসমূহ গণনা করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং লোকেরা সমুদ্রের সমুদায় জল কলসদ্বারা উঠাইতে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ শেষ করিতে পারেন না, সেই মত কোন ব্যক্তি ঐ গণেশ্বর মন্ত্রীর গুণগ্রামের

কথোপকথনে বর্তমান হইয়া সকল কহিতে পারেন না; এবং যাঁহার যাবৎলৌকিক কর্ম্মে ও বৈদিক কর্ম্মে শক্তির নিপুণতা আছে এবং চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ... একযুক্ত যে সেই গণেশ্বর মন্ত্রী, তিনি জয়যুক্ত হউন।

দিগ্‌দর্শন—মার্শম্যান সাহেব।

বিদ্যুৎ ও বজ্র।

সকল আকাশ বিদ্যুৎ পদার্থে পরিপূর্ণ। ঝড়ের সময়ে মেঘ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে পৃথিবীস্থ ... বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে, তাহাতে সে মেঘ ছাড়িয়া ... আকাশ ... আইসে, তৎপ্রযুক্ত মেঘ ফাটে, তাহাতে বৃহৎ শব্দ হয়, তাহাকেই বজ্র কহে। যে সময়ে বিদ্যুৎ মেঘ হইতে নির্গত হয় তখনি শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ... নিকটে তৎক্ষণাৎ শব্দ না পঁহুছিয়া কখন কখন কিছু কাল বিলম্বে পঁহুছে। যে হেতুক শব্দ আড়াই পলের মধ্যে ছয় ক্রোশ চলে, কিন্তু আলোক ইহা হইতে অতি শীঘ্র চলে, অতএব আলোক ও শব্দ এককালে নির্গত হয় বটে, কিন্তু শব্দ হইতে আলোক অগ্রে আইসে। যদি কেহ নিশ্চয় করেন যে বিদ্যুতের আলোকদর্শনের কতক্ষণ পরে শব্দ শুনা যায়, তবে তিনি একরূপে গণনা করিলে জানিতে পারিবেন, যে তাঁহা হইতে বিদ্যুৎ কত অন্তর আছে। যদি আলোকদর্শনের আড়াই পল পরে তিনি শব্দ শুনেন, তবে ছয় ক্রোশ অন্তরে বিদ্যুৎ নির্গত হইয়াছে জ্ঞাত হইবেন।

বিদ্যুৎ প্রায় উচ্চ বস্তুর উপরে পড়ে। এই কারণ ঝড়ের সময়ে বৃক্ষের নীচে থাকা অকর্ত্তব্য। কোন কোন বস্তুর এমত স্বভাব যে তাহারা অন্য বস্তু হইতে বিদ্যুতীয় অগ্নিকে অতিশয় আকর্ষণ করে। সকল ধাতু এই প্রকার স্বভাব প্রাপ্ত, এই হেতুক খাপ সমেত তলোয়ারের উপরে বিদ্যুৎ পড়িলে কখন কখন মধ্যের তলোয়ার দগ্ধ হয়, উপরে খাপের কাষ্ঠ দগ্ধ হয় না।

পণ্ডিতেরা এই মত কল সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তাহা হইতে বিদ্যুতীয় অগ্নি নির্গত হয়, তাহার স্বভাব বিদ্যুতীয় অগ্নির মত। যখন সেই কল ঘুরাণ যায় তখন তাহা হইতে বিদ্যুতীয় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, এবং যদি কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গে তৎক্ষণাৎ ঝিঞ্ঝিনী লাগে। এই কলের দ্বারা যে ঝিঞ্ঝিনী হয় সে বিদ্যুতীয় ঝিঞ্ঝিনীর সমান, কেবল বিদ্যুত হইতে ইহার বল অল্প, এই মাত্র বিশেষ। যখন এই কল সৃষ্টি হইল তখন পণ্ডিতেরা ইহা জানিতে চেষ্টা করিলেন, যে কল হইতে যে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সে স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গের স্বভাব মত কি না।

অনেক উদ্যোগের পর ফ্রাঙ্কলিন সাহেব, আমেরিকা দেশের একজন জ্ঞানবান, এই বিষয় নিশ্চয় করিল। সে ভাবিল যে যদি মেঘের সহিত কোন বস্তু সংলগ্ন করা যায়, ও যদি সে বস্তু পৃথিবীর উপরে কোন বস্তুতে বদ্ধ থাকে, তবে বিদ্যুতীয় অগ্নি মেঘ ছাড়িয়া সেই বস্তুর উপরে লাগিবেক, এবং তাহা বাহিয়া বিদ্যুতীয় অগ্নি পৃথিবীস্থ সেই বস্তুতে আসিবেক, এই নিমিত্ত ঐ সাহেব ১৭৫২ সনে এক

মাত্রে একটা লৌহশলাকা মৃত্তিকাতে গাড়িল, এবং মেঘ হইতে সে একটি ঘুড়ী উড়াইল, ও সেই লৌহশলাকাতে সুতীর রজ্জু বাঁধিয়া রাখিল। কিছু কাল পরে দেখা গেল যে সেই রজ্জু হইতে কতক স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, তাহাতে সে জানিল যে বিদ্যুতীয় অগ্নি লৌহশলাকাতে পঁহুছিয়াছে। অতএব ঐ লৌহশলাকা দ্বারা সে ও আর আর পণ্ডিতেরা বিদ্যুতীয় অগ্নির নিশ্চয় স্বভাব জানিতে পারিল।

ঐ ফ্রাঙ্কলিন সাহেব বিদ্যুতের ভয়নিবারণার্থ প্রথমযত্নে লৌহশলাকা দিতে লোকেরদিগকে শিক্ষাইল, সে এই প্রকার, ঘর হইতে উচ্চ একটা লম্বা লৌহশলাকা ঘরের নিকটে মৃত্তিকাতে পোঁতা যায়, তাহার অগ্রভাগ অতি-সূক্ষ্ম। যখন বিদ্যুৎ ঘরের নিকটে আইসে, তখন কোন অপচয় না করিয়া ঐ লৌহশলাকাতে পড়ে, এবং তাহা বাহিয়া মৃত্তিকাতে প্রবেশ করে। সেই লৌহশলাকা স্থানে২ ঘরের সহিত কাঠদ্বারা বদ্ধ থাকে, কিন্তু কাষ্ঠ অনাকর্ষক বস্তু, এই নিমিত্ত কাষ্ঠদ্বারা ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। যদি সেই সময়ে ঐ লৌহশলাকা কেহ স্পর্শ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। যখন ফ্রাঙ্কলিন সাহেব প্রথম এই বিষয় নিরূপণ করিল, তখন রুশিয়া দেশে এক জ্ঞানবান লোক এইরূপ করণার্থে আপন ঘরে একটা লম্বা লৌহশলাকা এক কাঁচের বাটীতে রাখিল, যে বিদ্যুতের অগ্নি সেই শলাকাতে থাকে, এবং সেই শলাকাতে অন্য এক পিত্তল শলাকা বান্ধিয়া আপন কুঠরীতে আনিয়া রাখিল।

পরে ঝড় বৃষ্টি আইলে বিদ্যুৎ ঘুড়ীর উপরে পড়িয়া তাহার দ্বারা সেই শলাকার উপরে আইল, ও সে সাহেব অকস্মাৎ তাহার নিকটে যাইবামাত্র বিদ্যুতের দ্বারা মরিল।

নিশ্চল তারা।

ধূমকেতু ভিন্ন তারা দুই প্রকার; গ্রহ ও নিশ্চল তারা; গ্রহ নিয়মানুসারে চলে, তাহা সর্ব্বদা এক স্থানে থাকে, তাহাতে তাহাদের নাম নিশ্চল তারা হইয়াছে; গ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী, এই হেতুক তাহারদের তেজ স্থির। অতি দূরত্বপ্রযুক্ত, অনেক পরমাণু ব্যবধানহেতুক নিশ্চল তারার তেজ অস্থির, তাহাতেই চিক্‌মিক করে, এমত জ্ঞান হয়। ইহাতে গ্রহ ও নিশ্চল তারার বৈলক্ষণ্য জানা যায়। নিশ্চল তারারদের সকল হইতে আশ্চর্য্য বিবরণ এই, যে তাহারা আপন স্থান কখন ত্যাগ করে না। পৃথিবীর প্রতিদিন ঘূর্ণনেতে জ্ঞান হয়, যে আকাশের মধ্যে সকল তারা চলে, কিন্তু বাস্তবিক নয়, যে হেতুক যে কোন দুই তারা পরস্পর যত দূর কিম্বা নিকটে থাকে, তাহার অন্যথা কদাচ হয় না। যদি নিশ্চল তারা গ্রহের মত চলিত, তবে উভয় তারা কখন নিকট, কখন দূর হইতে পারিত।

এমত বুঝা যায় না, যে সমস্ত নিশ্চল তারা পৃথিবী হইতে সমান নিকট কি সমান দূর, এবং তাহারদের অসংখ্য শূন্য স্থানে এমত স্থিতি আছে; যে নিশ্চল তারা আমাদের সূর্য্য হইতে যত দূর তাহা হইতে অন্য নিশ্চল তারা তত দূর, এমত বুঝা যায়, এবং যদি তারাতে লোক বসতি থাকিত,

তবে সে লোক আমারদের সূর্য্যকে তারাজ্ঞান করিত, ও অন্য অন্য তারাকে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ জ্ঞান করিত। আমারদের নিকটে সকল তারা সমান দেখা যায় না, তাহার কারণ এই, [illegible] কোন তারা নিকট, যে তারা নিকট সে বড় দেখা যায় যে দূর সে ক্ষুদ্র দেখা যায়। এই নিমিত্ত জ্যোতির্ব্বিদেরা ছয় ক্রম তারা নিরূপণ করিয়াছেন, যে তারা আমাদের নিকট ও তেজস্বী তাহারদের প্রথম পর্য্যায় নাম করিয়াছেন, এই রীতিক্রমে অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয়াদি পর্য্যায় নামে সকল তারা নিরূপণ করিয়াছেন। যে অবধি দূরবীণ সৃষ্টি হইয়াছে তদবধি অনুসন্ধান করা গিয়াছে, যে নিশ্চল তারা অসংখ্য আছে, যত বড় ও উৎকৃষ্ট যত দূরবীণ তাহাতেই ততোধিক তারা দেখা যায়।

নিশ্চল তারার দূরত্ব মনে ভাবিলে, পৃথিবীর উপরে যে দূরত্ব ও নিকটত্ব ও উচ্চত্ব ও নীচত্ব এ সকল জ্ঞান লুপ্ত হয়, যেমন অকস্মাৎ ও অনন্ত সমুদ্র দর্শন করিলে নদী কূপ প্রভৃতি জলাশয়ের মনে লাগে না। যে তারা অন্য তারা হইতে নিকট দেখা যায়, পৃথিবীর ঘূর্ণনের সময়ে এক কালে পৃথিবী সে তারার নিকটবর্ত্তিনী হয়, এবং অন্য কালে পৃথিবী সে তারা হইতে নয় কোটি ক্রোশ দূরে থাকে, তথাপি তখন ও সে তাহা ছোট কি বড় জ্ঞান হয় না, ইহাতে তাহারদের দূরত্ব অল্প অনুভূত হয়; যদি নিকটস্থ তারাই এইরূপ তবে দূরবর্ত্তী তারা কত দূর।

জ্যোতির্ব্বেত্তারা অনুমান করিয়াছেন, যে এমত দূরবর্ত্তী নিশ্চল তারা আছে যে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্যাপর্য্যন্ত

যে তারার আলোক আমাদিগের নিকটে এত বেগরূপে আসিতেছে, কিন্তু অদ্যাপি পৌঁছে নাই।

যদি তারা সূর্য্য হইতে এত দূর, তবে তাহারা সূর্য্য হইতে আলোক পাইতে পারে না, ইহাতে অনুমান এই হয় যে তাহারা স্বকীয় তেজেতেই আপনারা দীপ্ত হয়, যে সূর্য্যের তেজ তাহাদের নিকট পঁহুছিতে পঁহুছিতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। ইহাতে অনুমান হয় যে আমাদের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে সৌর জগৎ যেমন আছে, তেমন প্রত্যেক নিশ্চল তারা আমাদের সূর্য্য বৎ, ও তাহার চতুর্দ্দিকে তত্তাদ্রূপ সৌর জগৎ ঘোরে।

প্রবোধচন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

অর্দ্ধ জরতীয় ন্যায়ের বিবরণ।

অতিবড় উদার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুর্ভিক্ষসময়ে অন্নাভাবে পরিজন প্রতিপালনে অত্যন্ত অসমর্থ হইয়া এক স্বকীয় গোকে প্রতি হট্টে লইয়া যায়। ক্রেতা ব্যক্তিরা বয়ঃক্রম জিজ্ঞাসা করিলে পর যেমন আমাদের অধিক বয়স হইলে প্রচীন জানিয়া অন্য হইতে কিছু অধিক দেয় তেমনি আমি যদি এ গোর অধিক বয়স কহি তবে প্রাচীনজ্ঞানে অধিক মূল্য হইতে পারিবে, যে কারণে প্রাচীনেতে লোকেরদের অধিক আস্থা হয়, অধিক পরমায়ু হইলেই প্রাচীন হয়। মনে মনে এই বিচার করিয়া কহেন যে আমার এ পৈতৃক গো। অতি প্রাচীনা, বৃদ্ধপ্রপিতামহ-

বস্তুতঃ দেহধর্ম্ম, ইনি বালক, ইনি যুবা, ইনি স্থবির ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে আত্মবিষয়ে ঔপচারিক, লোহিত স্ফটিক ইত্যাদিবৎ, অতএব এ গো ব্যক্তি অস্থ্যংশে জরতী, শরীরাংশে তরুণী হইতে পারেন, অতএব এ গোকে অর্দ্ধজরতী কহিতে পারি। ব্রাহ্মণ এতাদৃশ তর্কবিচারে এই স্থির করিলে পর এক ক্রেতা ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে গোর বিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন ওরে বাপু আমার এ গোটী অর্দ্ধজরতী অর্দ্ধেক যুবতী। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া কহিল যে এ ব্রাহ্মণ অতিবড় অমায়িক বিষয় জ্ঞান কিছুই নাই।

গতানুগতিক ন্যায়ের বিবরণ।

প্রত্যহ অরুণোদয়কালে সিন্ধুস্নানার্থে সিন্ধুতটে অনেক ব্রাহ্মণেরা যান। সকলেরি পিতৃতর্পণার্থ তাম্রমাত্র অর্থাৎ কোশা, প্রাদেশপাত্র প্রমাণ একাকার। আপন আপন তাম্রপাত্র মার্জ্জন করিয়া সাগরতীরে রাখিয়া সকলে অবগাহন করিয়া তর্পণ করিতে কোশা লয় যে কালে, তখন কে কাহার কোশা লয় ইহার নিশ্চয় কিছু থাকে না, এইরূপে ব্যবস্থিতিনিয়ম প্রায় অনুদিন হয়। এক দিবস ধার্ম্মিক এক বৃদ্ধ বিপ্র বিবেচনা করিলেন যে প্রতিদানব্যতিরেকে সামগ্রী বিপর্য্যয়েতে অদত্ত দ্রব্যগ্রহণরূপ চৌর্য্যদোষ হয়, অতএব যেরূপে ইহা না হয় তাহা করা উচিত। এই বিচার করিয়া স্বতাম্রপাত্রের বিশেষ জ্ঞাননিমিত্তে তদুপরি বালুকাগোল স্থাপন

করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। তৎপর আর আর ব্রাহ্মণ সকলেই ক্রমে ক্রমে দেখাদেখি স্বকীয় স্বকীয় তাম্রপাত্রের উপরে একৈকসৈকত পিণ্ড স্থাপন করিয়া অবগাহনার্থে গেলেন। পরে ঐ স্থবির, স্নান করিয়া অবলোকন করেন যে একজাতীয় চিহ্নে চিহ্নিত তাবৎ ঠাঁইয়ার কোষা। ইহাতে হাস্য করিয়া কহিলেন অহো! এ বড় আশ্চর্য্য! সকল লোকই গতানুগতিক, অর্থাৎ দেখাদেখি পরস্পর কর্ম্ম করে, তত্ত্বযাথার্থ্য কেহ বিবেচনা করেনা. যদি বুদ্ধি পূর্ব্বকারী হইত তবে একাকার চিহ্ন দিত না। যে কৌতুক একাকার চিহ্ন-দানে তদ্ধোকের তানবস্থা দেখিতেছি. সকলেই অবিশেষ চিহ্ন প্রদান করিয়াছে. অতএব প্রায় সকলেই অসমীক্ষকারী অর্থাৎ একজন প্রধান যাহা করে তাহা দেখিয়া অন্যে তাহা করে এবং অপর অদৃষ্টক্রমে করে। এতদ্রূপে প্রায় লোকেরা গড্ডলিকাপ্রবাহন্যায়ে, অন্ধপরম্পরা ন্যায়ে বা এ সংসা-রান্ধকূপে পড়ে। গড্ডলিকা অর্থাৎ গাড়র, তারদের যুথের মধ্যে একটা যদি জলে পড়ে, তবে সবগুলা জলে পড়ে। আর যেমন বা শ্রেণীবদ্ধ অন্ধেরদের একটা যে গর্ত্তাদিতে পড়ে সকলেই পরস্পর কেহ কাহাকে ছাড়িতে না পারিয়া জড়াজড়ি করিয়া তাহাতেই পড়ে এই প্রকার নানা রূপ বিবেচনা করিয়া ঐ বুড়া বামন তদবধি তথা স্নান করা ছাড়িল।

অন্ধহস্তিদর্শনের কথা।

একস্থানে কতকগুলি অন্ধ বসিয়াছিল, দৈবাৎ তারদের অদূরে এক হস্তী উপস্থিত হইল। ঐ অন্ধেরা লোকেরদের

কোলাহল হওয়াতে হাতীর আসা শুনিতে পাইয়া হাতী দেখিতে সকলেই গেল। কিন্তু তারদের মধ্যে নিরাকাঙ্ক্ষ এক বৃদ্ধ পণ্ডিত ছিল, কেবল সে গেল না। পরে ঐ অন্ধেরদের মধ্যে কেহ হস্তীর পাদ, কেহ শুণ্ড, কেহ বা উদর, কেহ বা পুচ্ছ, কেহ বা কর্ণ স্ব স্ব হস্তে স্পর্শ করিয়া ঐ বৃদ্ধের নিকটে আইল। বৃদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে হস্তী কেমন দেখিলা কহ। তাহাতে পাদস্পর্শী কহিল, স্তম্ভাকার হস্তী। শুণ্ডস্পর্শী কহিল, না না তেমন নয়, সর্পাকার হস্তী। উদরস্পর্শী কহিল, দূর বেটা তুই কিছু জানিস না, হাতীটা ঢাকের মত। পুচ্ছস্পর্শী কহিল, উঁহু এমন নয় গোলাঙ্গুলাকার হস্তী। কর্ণস্পর্শী কহিল, তোমরা কেহ কিছু জান না আমি যথার্থ কহি কুলার মত হাতীটা। অনন্তর সকলের পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ বৃদ্ধ কহিলেন, তোমরা বিরোধ করিও না, আমি তোমারদের সকলেরি বাক্যের প্রামাণ্য রাখিয়া হস্তীর স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিতেছি, শুন তোমরা সব একৈকপ্রদেশস্পর্শী, সকলেই লোচনবিহীন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কাহারো হয় নাই। প্রত্যেকে হস্তীর একৈক দেশ স্পর্শ করিয়াছ। স্বাচ প্রত্যক্ষ তোমারদের সকলেরি সমান হইয়াছে, অতএব যে যা স্বস্বজ্ঞানানুসারে বলিতেছ সে যথার্থ বটে মিথ্যা নয়। কিন্তু এক জাতি বস্তু নানাপ্রকার হইতে পারে না, অতএব তোমারদের সকলের একজাতীয় প্রমাণের অদ্ভুত যে এক হস্তীর বিভিন্ন প্রদেশ সকল তাহার যথাযোগ্য অবয়ববিশেষ সন্নিবেশেতে এক অবয়বী হস্তীর স্বরূপ নিরূপণ করিয়া আমি কহি। চরণাকারেরদের স্তম্ভাকার-

পাদ, শূর্পাকৃতিকর্ণ, গোলাঙ্গুলাকৃতিপুচ্ছ, সর্পাকারশুণ্ড, এতাদৃশস্বরূপ হস্তিনামা চতুষ্পাদ পশুজাতি জানিও।

দশম ন্যায়ের বিবরণ।

দশ জন একত্র হইয়া কোন দেশে যাইতেছিল, পথিমধ্যে এক নদী ছিল, তাহা পার হইয়া পরপারে বসিয়া সকলে কহিল আমরা দশ জনা পার হইয়াছি, কিম্বা দশজনের মধ্যে কেহ পার হয় নাই ইহা জানা ভাল। এই পরামর্শক্রমে প্রথমতঃ এক জন অন্য নয় জন লোককে গণিয়া,আপনাকে না গণিয়া কহিল যে ওরে ভাইরা নয়জন যে হয়, আর এক জন কোথা গেল? ইহা শুনিয়া অন্য জন কহিল এমন কথা না, থাক আমি গণিয়া দেখি, এরূপ কহিয়া সেও স্বভিন্ন নয় লোককে সংখ্যা করিয়া সশঙ্ক হইয়া, কহিল যে বটেত, নয় জনই যে হয়, দশম কি হইল। এইরূপে দশজন একে একে আত্মবিস্মরণে বাহ্যমাত্রাভিনিবিষ্টচিত্ততাতে কেবল বাহ্য-গণনা করিয়া দশম নাই এই নিশ্চয় করিল। অনন্তর সকলেই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, ওহে দশম কোথা আছ শীঘ্র আইস, আমরা সকলেই তোমাকে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইতেছি, তোমাকে পাইলেই সুখী হই, অত-এব যেথা থাক শীঘ্র আইস। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া পুনরায় সকলে যুক্তি করিয়া এই নিষ্কর্ষ করিল যে বুঝি আমারদের সঙ্গে পরিহাস করিয়া এই বনে লুকাইয়া আছে। চল সকলে বনের মধ্যে গিয়া তত্ত্ব করি সে বড় দুষ্ট, যদি পাই . . . আমাদিগের বড় দুঃখ দিতেছে ভাল বুঝিব। ইহা কহিয়া

সেই কণ্টকিত নানাজাতীয় লতাবেষ্টিত নিবিড় বিপিনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরে সেই অরণ্যে গাছের আড়ে, কুঞ্জমধ্যে, পর্ব্বতে, উপত্যকাতে, কন্দরে, গুহাতে, সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কোথাও কিছু তত্ত্ব না পাইয়া পুনর্ব্বার ঐ নদীতীরে আসিয়া মন্ত্রণা করিল, যে বুঝি নদীপার হইতে হইতে ডুবিয়া মরেছে, আইস দেখি, খুঁজি। ইহা মনে করিয়া নদীর মাঝে খুঁজিয়া কোথাও কিছু টের না পাইয়া পাঁক কাদা মেওলামাখা গায়ে নদীর পাড়ে বসিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন ও গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কাকুতি বিলাপ করিয়া কেহ বা বুক চাপড়ায়, কেহ বা মাথা কুড়ে, কেহ বা ধূলায় গড়াগড়ি পাড়ে, কেহ বা আছাড় খাইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে আত্মদর্শী নামে একজন তথাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত করুণান্বিত হইয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এ দুর্দশাগ্রস্ত কি কারণে হইয়াছ, তাহা আমাকে কহ। ইহা শুনিয়া তাহারা আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত কহিল। তদনন্তর আত্মদর্শী বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে ইহারা সকলেই আত্মবিস্মৃত। আত্মস্বরূপ বিস্মরণ সর্ব্বানর্থের নিদান হয়। ধন্য জগন্মোহিনী পারমেশ্বরী শক্তি যে আত্মজ্ঞানাধীন সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, সে স্বয়ং প্রকাশমান আত্মাকেও বিস্মৃত করান। আহা এ জীবেরা আত্মাকে ভুলিয়া না গুণিয়া ঐতাদৃশ দুঃখ পাইতেছে। ইহা মনে মনে করিয়া কহিলেন যে হে আত্মবিস্মৃতেরা উঠ মোহ শোক রোদন ত্যাগ কর। তোমাদের দশম মরে নাই, আছে, আমি দেখাইয়া দিতেছি, স্থির হও অন্তঃকরণ সুস্থ কর। আত্ম-

দর্শীর এই বাক্য শুনিয়া আত্মবিস্মৃতেরা অন্তরাক্ষে উঠিয়া কহিলেন কই কই আমারদের দশম কোথায় আছে, তুমি যদি আমারদের দশমকে দেখাইতে পার তবে যার পর নাই এমন উপকার কর। আত্মদর্শী কহিলেন ভাল ভাল কিন্তু তোমরা বাহ্য বিষয়মাত্রেই অত্যন্ত অভিনিবেশ করিও না। আত্মজ্ঞানে সাধক হও. বাহ্যগণনা করিয়া আত্মগণনা করিলে কিম্বা আত্মাকে ধরিয়া বাহ্যগণনা করিলে তোমরা সকলেই দশম হইবা। আদি মধ্য শেষ সকলেই দশম। তোমরা সব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াও. আমি দেখাইয়া দি। এ বাক্য শুনিয়া তাহারা সব একশারি হইয়া দাঁড়াইল। পরে আত্মদর্শী প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াবধি প্রথম পর্য্যন্ত তৃতীয়াবধি দ্বিতীয় পর্য্যন্ত এবং চতুর্থাদারভ্য তৃতীয়াদি পর্য্যন্ত মালার ন্যায় গণনা করিয়া সকলকে দশমরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। তদনন্তর তাহারা সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া কহিল যে আপনারা মনে বুঝিয়া দেখতো ইনি ত [illegible] আমারদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমারদিগকে [illegible] তা নাই। ইহা কহিয়া আত্মদর্শীকে কহিল আপনি [illegible] হওতো. আমরা আপনারা মনে যুক্তি করিয়া বুঝি. তবে আমারদের প্রামাণ্য হইবেক। ইহা কহিয়া সকলেই প্রত্যেক মনন করিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপে স্বস্ব স্বরূপ দশমকে পাইয়া মোহ শোক দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া কৃতকৃত্য এবং অতি সন্তুষ্ট হইয়া নিরতিশয় সুখ পাওত [illegible] পাইল। * * * *

অন্ধপঙ্গুন্যায়ের কথা।

এক ব্যক্তি অন্ধ দর্শনসামর্থ্যহীন, আর এক ব্যক্তি পঙ্গু অর্থাৎ খোঁড়া গতিশক্তিশূন্য। এতাদৃশ দুই জনের পৃথক্‌যোগে তাদৃশ ক্রিয়া সংসিদ্ধ হইতে পারে না। পঙ্গুর চক্ষুষ্মত্তা তাহলে উভয় সংযোগেতে যেমন ক্রিয়াসিদ্ধি হয় সেইমত প্রকৃতি পুরুষ সংযোগেতে ভোগ মোক্ষ ক্রিয়া সিদ্ধি হয় উভয় বিয়োগেতে ক্রিয়াসিদ্ধি হয় না ইহা সাংখ্য দার্শনিকেরা কহেন।

এই অন্ধপঙ্গুন্যায়ের পাতঞ্জল দার্শনিকেরা প্রকারান্তরে বর্ণনা করেন। যেমন এক মহাপুরুষ থাকেন তাঁর ক্ষেত্রজ্ঞ নামে এক পঙ্গুদাস থাকে, এবং প্রকৃতি নামে এক দাসী থাকে। এক দিবস ঐ মহাপুরুষ পঙ্গুদাসকে কহিলেন আমার সংসারের সকল কর্ম্মের ভার তোমাকে দিলাম, তুমি সকল কর। অন্যসময়ে ঐ অন্ধ দাসীকেও তদ্রূপ আজ্ঞা দিলেন। পরে খোঁড়া ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া ভাবিতে লাগিল, যে আমি খোঁড়া গতিশক্তিরহিত স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন কিরূপে করিব। এই চিন্তাতে উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া আছে, ইত্যবসরে ঐ অন্ধ দাসী তাদৃশ ভাবনাতে ভাবিত হইয়া তথাতে গিয়া বসিল। এইরূপে কাকতালীয়ন্যায়ে উভয়ের সহবাস হওয়াতে অন্যোন্যের বিষয় অন্যোন্য অবগত হইয়া দুই জনে যুক্তি করিয়া পঙ্গুদাস অন্ধ দাসীস্কন্ধে আরোহণ করিয়া পরস্পর সাহায্যে প্রভুর আজ্ঞানুসারে তৎসংসারের সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল।

নষ্টাশ্ব দগ্ধরথন্যায়ের বিস্তার।

দুই জন রথে চড়িয়া এক বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, দৈবাৎ সেই দুজনের মধ্যে দাবানলেতে একজনের রথ পুড়িয়া গেল, অশ্ব থাকিল, অন্য ব্যক্তির অশ্ব পুড়িয়া মরিল, রথ থাকিল। এতদ্রূপে এক জন নষ্টাশ্ব, অন্য জন দগ্ধরথ হইয়া অটবীতে থাকে; এক দিবস দৈবাৎ দুই জনেতে দেখা হইল। অনন্তর উভয়ে যুক্তি করিয়া এক জনার রথেতে অন্যের অশ্ব যোজনা করিয়া অনায়াসে পরম সুখে স্বদেশ পাইল। এবম্বিধ ন্যায়ে মনুষ্যেরা নিষ্কাম শুদ্ধ কর্ম্মরূপ রথেতে সংযোজিত পরমেশ্বরস্বরূপ জ্ঞানরূপ অশ্বেতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে পরমসুখেতে অবশ্য প্রাপ্তব্য পরমেশ্বরকে পাইবে ইহা প্রাচীন বেদান্তীরা কহিয়াছেন।

অন্যঃ বন্ধনন্যায়ের কথা।

অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত এক ব্যক্তি ক্ষুধাতে অত্যন্ত আতুর হইয়া উচ্চ এক স্তম্ভের উপরে শরীরের ভার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইত্যবসরে কোন পুরুষ কতকগুলি খই আনিয়া ঐ ক্ষুধার্ত্তকে কহিলেন, যে ওরে তুই অঁাজলা পাত, তোরে আমি কিছু খই দেই। একথাতে ঐ ক্ষুধার্ত্ত লোক অতিবা গ্রস্ততে তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ থামের দুই পাশে দুইহাত রাখিয়া অঞ্জলিপাতন করিল, পরে সে পুরুষ তার অঞ্জলিতে খই দিয়া গেল। অনন্তর ঐ ব্যক্তি আপনি খই ও খাইতে মুখ বাড়াইয়া না খাইতে পারে, না অন্যকে দিতে পারে, না ত্যাগ করিয়া বন্ধন মুক্ত হইতে পারে। অল্পে অল্পে লাজ্জা বাতাসে উড়িয়া যাইতে

থাকে, তথাপি আমি এই খই খাইব, এই দৃঢ়তর প্রত্যাশাতে হস্তদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত করিতে না পারিয়া হইয়া বন্ধনেতে বদ্ধ হইয়া থাকেন। এতাদৃশ ন্যায়েতে মানবেরা এক অঞ্জলি খই খাইবার প্রায় অতি তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ প্রত্যাশাতে এসংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে, একথা বেদান্তীরা কহিয়াছেন।

সাহিত্যসার।

রাজা রামমোহন রায় বেদান্তগ্রন্থের অনুষ্ঠানপত্র।

প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে নাই। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না; ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন, এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন, আর শুনেন, তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে, যখন, যাহা, যেমন ইত্যাদি

শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন, তাহা, সেইরূপ, ইত্যা-
দিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন।
যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গী-
কার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্
নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনু-
সন্ধান করিবেন, যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম
এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে, ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার
অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার
উদাহরণ এই। "ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন, আর
যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে
সকলের উপাস্য হয়েন"। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে
সকলের প্রথমে দেখিতেছি, তত্রাপি সকলের শেষে "হয়েন"
এই যে ক্রিয়াশব্দ তাহার সহিত ব্রহ্মশব্দের অন্বয় হই-
তেছে। আর মধ্যেতে "গান করেন" যে ক্রিয়া শব্দ আছে
তাহার অন্বয় বেদশব্দের সহিত আর "চলিতেছে" এ ক্রিয়া
শব্দের সহিত "নির্ব্বাহ" শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া
যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব
পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন, এই অনুসারে অনু-
ষ্ঠান করিলে অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর
যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই, এবং ব্যুৎপন্ন লোকের
সহিত সহবাস নাই, তাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে
অর্থবোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে
সমর্থ হইবেন। বস্তুত মনোযোগ আবশ্যক হয়। এই বেদান্-
তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বড় উত্তম পণ্ডিতেরা

শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে, তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।

কেহ২ কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্তে কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে, এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়, তাঁহাদিগো জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান, তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না, আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না, আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না, এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না, শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না, আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্র নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না? যদি এই রূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কি রূপে করিতে পারেন? সুবোধ লোক সত্য শাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন। কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয়। সেই রাজপ্রাপ্তি তাঁহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না, সেইরূপ রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এ বাক্য উত্তর যোগ্য নহে, তত্রাপি লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-

প্রাপ্তি নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে, সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না, এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি, যে রূপ গুণবিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন। দ্বিতীয়তঃ রাজা হইতে রাজার দ্বারী সুসাধ্য, এবং নিকটস্থ, সুতরাং তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয়, এখানে তাহার অন্যথা দেখি : ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ, তেঁহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন, কখন তাঁহার স্থিতি হয়, কখন স্থিতি না হয়, কখন নিকটস্থ, কখন দূরস্থ, অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা যায়। তৃতীয়তঃ চৈতন্যাদিরহিত বস্তু কি রূপে এই মত মহৎ-সহায়তার ক্ষমতাপন্ন হইতে পারেন। মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে, আর পূর্ব্বে কেহো পণ্ডিত কি ছিলেন না, এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই, যে তাঁহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে, তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছে। প্রথমত একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি, তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুররূপে বাস করেন, তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান তিন অর্দ্ধেক হইতে অধিক, পৃথিবীতে

এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন, তবে কি রূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনায় রত হয়। আর পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহ [illegible] করেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান্ ব্যাস এই সকল সূত্র নিরূপণ করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন, এবং বাজসনি বশিষ্ঠাদি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্মস্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। নব্য আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন এবং আপনাদের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকর্ত্তা আছেন। তবে আমি যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয় এমত নিয়ম যদি করহ তবে ইহার উত্তর নাই। এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশভ্রমণ করেন, তবে কদাপি এ সকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন হয় এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহ লোকে পর লোকে কৃতার্থ হই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

প্রভাকর।

ঢাকা, বিক্রমপুর এবং রাজনগর প্রভৃতির
পুরাতন উজ্জ্বল এবং নূতন মলিন
অবস্থা বর্ণনা।

আমরা "দাউদ কান্দি" হইতে নৌকা চালনাপূর্ব্বক পদ্মা ও কীর্ত্তিনাশা অতিক্রম করত [illegible] পড়িবার সন্ধ্যা [illegible] রাজনগরের খালের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকা সময়ে রাজনগরের বাজারের ঘাটে অতি উচ্চ সুদৃশ্য কাষ্ঠনির্ম্মিত পুলের নীচে আগমন করিলাম, ঐ রাত্রি তথায় অবস্থান করত পরদিবস প্রত্যূষে বৈদ্যকুলোদ্ভব মহারাজা রাজবল্লভের রাজভবন ও আর আর প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ দর্শনার্থ গমন করিলাম, বেলা দেড়প্রহর পর্য্যন্ত গুরুতর পরিশ্রমপূর্ব্বক, ক্রমশই ভ্রমণ করি, তথাচ সমুদয় দেখিয়া শেষ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ সর্ব্বনাশ্য কীর্ত্তিনাশা বিশেষবিশেষ কয়েকটি কীর্ত্তি নাশ করাতে অতিশয় দুঃখের বিষয় হইয়াছে। একজন পুরুষ হইতে এক সময়ে এত কীর্ত্তি স্থাপনা হওয়াই অত্যাশ্চর্য্য কহিতে হইবে। রাজনগর প্রকৃতই রাজনগর ছিল, ইহার মধ্যভাগে ক্ষুদ্র এক নদী, তাহার দুই পার্শ্বে কি ভদ্রলোকের বসতি। রাজনগরে ব্রাহ্মণ প্রায় এক সহস্র ঘর হইবে, ইহার মধ্যে অনেকেই কুলীন ও পণ্ডিত। ব্রাহ্মণের ভিতরে রাজপুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। মহারাজ আপনার ঐ পুরোহিতদিগ্যে জিলা ভুলুয়া ও বরিশালের মধ্যে

দীর্ঘতা প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে।—দোকান পশার বিস্তর। —সকল প্রকার দ্রব্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়।—ফল, মূল তর-কারি, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, পনির প্রভৃতি ও অন্যান্য সুলভ।—দুই সন্ধ্যা বাজার বসিয়া থাকে।—মঙ্গলবার ও বুধবারে হাট হয়।—বহুদূরের লোক এই বাজারে বাজার করিতে আইসে।—বাজারের কাঁসারিপটিতে অনেক [illegible]-নের দোকান, তথায় নানাপ্রকার বাসন প্রস্তুত হয়।—কাপুড়েপটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে।—বঙ্গদেশের ভিতরে যেমন ঢাকা জিলা সর্ব্বপ্রধান, ঢাকা জিলার মধ্যে যেমন বিক্রমপুর পরগণা সকল পরগণার প্রধান, সেইরূপ বিক্রমপুরের মধ্যে রাজনগর গ্রাম সকল গ্রামেরই প্রধান।

রাজনগরে 'রাজসাগর' সরোবর যেমন, সেই প্রকার বড় বড় সরোবর আরো অনেক আছে, যথা 'রাণীসাগর' 'আনন্দসাগর' 'কৃষ্ণসাগর' ও 'সুখসাগর' প্রভৃতি, ইহার কোনোটীই ক্ষুদ্র নহে, প্রায় তুল্য, অতি মনোহর। কি পরিতাপ! সুখসাগর-প্রভৃতি কয়েকটা ডাগর সাগর কীর্ত্তি-নাশায় গ্রস্ত হইয়া অধুনা তাহারি হৃদয়ে বিহার করিতেছে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নদীর তটে অনেক রম্য হর্ম্ম্য ও সুচারু উদ্যান সকল তনুত্যাগ করিয়াছে।—সম্প্রতি তাহারদিগের কোনরূপ চিহ্নও আর দেখা যায় না, ঐ কীর্ত্তিনাশা পৃথ্বী-পালের, কত কীর্ত্তি ও কত বৃত্তি নাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না।—এই দুর্ঘটনা কিছু বহুদিন হয় নাই, অত্যল্প দিবস হইল,—যাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন তাঁহার-দিগের প্রমুখাৎ সবিশেষ শ্রবণ করত যখন চমৎকৃত হইলাম,

প্রায় বোধ হয়, ইহার গাঁথুনির পারিপাট্য কি ব্যাখ্যা করিব! এত প্রাচীন হইল, জন্মাবধি কখনই মেরামত হয় নাই, তথাচ এপর্য্যন্ত কোনঘরেই একবিন্দু জল পড়ে না, ভাঙ্গে নি, ও চুণ সুর্কির আস্তর বা জমাট।

তৎপরে এক রত্ন, নবরত্ন, সপ্তরত্ন, পঞ্চরত্ন রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, আর আর দেবমন্দির, পূজার বাটী, নৃত্যাগার, বৈঠকখানা দেওয়ানখানা, ও বসতি বাটী-প্রভৃতি একে একে দর্শন করিলাম। একুশরত্নের কথাই নাই, অদ্যাপি তাহা অবিকল নূতন রহিয়াছে, কিছুমাত্র রূপান্তর হয় নাই। এই রত্নটী পঞ্চতল। দ্বিতীয়তলে পঞ্চ তৃতীয়তলে পঞ্চ, চতুর্থ-তলে পঞ্চ, পঞ্চতলে পঞ্চ এবং সর্ব্ব ঊর্দ্ধে এক রত্ন। প্রত্যেক রত্নেই এক এক ঘর ও বারাণ্ডা এবং বেদী।—এই রত্নই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহার উপরে উঠিলে চতুর্দ্দিক বিচিত্ররূপে বিলোকিত হয়, ঐ সর্ব্বনাশা সমুদ্রবিশেষ কীর্ত্তিনাশাকেও ক্ষুদ্র এক খালের ন্যায় দেখা যায়।

সকল রত্নেরি শোভাই এইরূপ মনোলোভা।—বৈঠক-খানা প্রভৃতি ঘরসকল জনশূন্য অরণ্যময়। তাহার উপর বড় বড় বৃক্ষ হইয়াছে, কোন কোন গৃহের কড়ি, বরগা, ছাদ নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীর সকল সমভাবেই রহিয়াছে, তাহার কোন অংশই ধ্বংশ হয় নাই, একখানি ইট খসে নাই, ইট হইতে বিন্দুমাত্র চুণ খসে নাই, বৃষ্টির জলে কিছুই চুঁয়ে নাই পোকা ধরে নাই, জমাট রসে নাই। পুনর্ব্বার ছাদ প্রস্তুত করিয়া দিলেই স্বচ্ছন্দে আবার একশত বৎসর সুখে বাস হইতে পারে।

বহির্ব্বাটীর কতিপয় প্রকোষ্ঠ এবং অন্তঃপুরের অনেকাংশ অদ্যাপি নাশ হয় নাই, সদ্ভাবেই আছে, রাজপরিবারেরা এইক্ষণে তন্মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন।

সম্প্রতি আমাহারদিগের নৌকারোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে করিতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নদীর উভয় তীরে স্থানে স্থানে শুদ্ধ রাজবল্লভের [illegible] কীর্ত্তির [illegible] দেখিতে পাইলাম। এবং নদীর উপরে কিয়দ্দূরে ও কিঞ্চিৎ দূরে স্থানে স্থানে ঐরূপ অনেক কীর্ত্তি অদ্যাপি মন্দির, মণ্ডপ, ও চত্বর রহিয়াছে [illegible] পদ্মা [illegible] তৎসমুদায় অধিকাংশ দেখিতে পাইলাম না, একারণ অন্তঃকরণে অতিশয় খেদ রহিয়া গেল।

উক্ত মহাত্মা যত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, অধুনা তাহার অর্দ্ধেক নাই, পদ্মা যাহা নাশ করত কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়াছে।

রাজা রাজবল্লভ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারসী, আরবী, হিন্দি প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় অতিশয় যোগ্য এবং রাজকর্ম্মে ও অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন, তাঁহার ন্যায় পরোপকারী ও দাতা ব্যক্তি প্রায় কাহাকেই দেখা যায় না।

আমি বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি, বঙ্গবাসী যে সকল মহাশয় নৌকাযোগে ঢাকা, বিক্রমপুর, কমিল্লা, সুধারাম ও চট্টগ্রাম-প্রভৃতি প্রদেশে আগমন করেন, তাঁহারা যেন একবার রাজনগরে আসিয়া মহারাজ রাজবল্লভের কীর্ত্তিকলাপ দর্শন করেন। বরিশাল হইতে রাজনগর হইয়া উল্লেখিত সমুদয় স্থানে গমন করিতে হইলে, কেবল এক

দের কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম ছিল, তাহা বর্ণনা করিলে আপাততঃ উৎকট বোধ হইবে। তাহারা তাঁহার নিকটস্থ হইয়া উপদেশ শুশ্রূষায় পিতামাতা ও ক্রীড়া কৌতুকাদি সমস্ত পরিহার করিত। ইহার এক উদাহরণ আলকিবায়েডিসের চরিত্রেতে দৃষ্ট হইয়াছে! আলকিবায়েডিস অতি প্রচণ্ডস্বভাব প্রযুক্ত স্বজাতীয় লোকের মধ্যে সদা অহঙ্কারে আস্ফালন করিতেন। সক্রেটিস কখনও তাঁহার ঐ গর্ব্ব ও আস্ফালন দমনে ত্রুটি করেন নাই। উদারবংশ্য যুবকেরা ধন গৌরবে যে প্রকার স্ফীত হইয়া থাকে, আলকিবায়েডিস এক দিবস তদ্রূপ স্ফীত হইয়া ধনসম্পত্তির দর্প করিতেছিলেন, সক্রেটিস তাহা দেখিয়া উঁহাকে এক ধরাতলের খেপ অর্থাৎ নকসাতে আটিকাদেশ লক্ষিত করিতে কহিয়াছিলেন। কিন্তু অতি ক্ষুদ্রতাহেতুক ঐ দেশ প্রথমতঃ উঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, পরে বহু ক্লেশে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "এদেশ অতি ক্ষুদ্র নকসাতে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।" সক্রেটিস উত্তর করিলেন "তবে দেখ তুমিও কেমন ক্ষুদ্র পরিমাণ ভূমির জন্যে অভিমান করিয়া থাক।" একথা আরো বাহুল্যরূপে বিস্তার করিলে হানি হইত না, যেমন এথেন্স যেমত সমস্ত গ্রীকদেশের সহিত তুলনাতে বিন্দুমাত্র বোধ হয়, তদ্রূপ গ্রীসদেশ ইউরোপের পক্ষে, ও ইউরোপ পৃথিবীর পক্ষে, এবং পৃথিবীও দশদিকস্থ অপরিচ্ছিন্ন খগোলের পক্ষে অণুমাত্র, অতএব অতি পরাক্রান্ত রাজ্যও এই অপার ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্ত আকাশের মধ্যে ক্ষুদ্র কীট ও নগণ্য!

অপর এথেন্স নগরীয় যুবকেরা থেমিষ্টক্লিস, সাইমন, এবং পেরিক্লিশের সম্বৃদ্ধদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিল এবং আপনার ও যশঃস্পৃহাতে মুগ্ধ হইয়া তাত্ত্ব তার্কিকেরদের উপদেশ গ্রহণানন্তর আপনাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সক্ষম জ্ঞান করিয়া উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা করিত, কেননা ঐ তার্কিকেরা স্বশিষ্যদিগকে উত্তম রাজনীতিজ্ঞ করিবেন বলিয়া আড়ম্বর করিতেন। ঐ যুবকদের মধ্যে প্লাতো নামে একজন বিংশতি বৎসর বয়ক্রমেই রাজকীয় কার্য্যের ভার প্রাপণার্থ এমত দৃঢ়তর আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে কেহই ঐ দুরাগ্রহ ও অসঙ্গত স্পৃহা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই, কেবল সক্রেটিস ঐ বালকের ভ্রাতা ক্রেটোর অনুরোধে নানাবিধ প্রবোধবাক্যে উক্ত অভিলাষ হইতে তাহাকে ক্ষান্ত করাইয়াছিলেন।

সক্রেটিস এক দিবস উঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া এমত সারল্যের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিল। সক্রেটিস কহিলেন, "তুমি কি রাজ্যের মন্ত্রের ভার লইতে অভিলাষ করিতেছ?" প্লাতো উত্তর করিল, "হাঁ তাহাই বটে।" সক্রেটিস পুনশ্চ কহিলেন, "অভিলাষ মহোদয়ের পক্ষে উচিত বটে, কেননা, এমত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে বন্ধুবর্গের মহোপকার করিতে পারিবেন। এবং পৌরজনের শ্রীবৃদ্ধি ও দেশের উন্নতিসাধনেরও সক্ষম হইবেন, তাহাতে আপনার সুখ্যাতি এথেন্স নগরেও সমস্ত গ্রীক দেশে ব্যাপিবার সম্ভাবনা, এবং থেমেষ্টক্লিশের ন্যায় স্লেচ্ছ জাতিদের মধ্যে ও তোমার

যশো বিস্তার হইবে, আর তুমি যেখানে থাক, পৃথিবীর সকল লোকেরই প্রতিষ্ঠাভাজন হইবে।"

সক্রেটিসের এমন মধুর মনোরমা উক্তিতে ঐ গর্বিত যুবক অত্যন্ত আহ্লাদিত ও মোহিত হইয়া ঔৎসুক্যপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল, সুতরাং শুনাইবার নিমিত্ত আর অধিক অনুরোধ করিতে হইল না। পরে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। সক্রেটিস বলিলেন, "তুমি যশ ও সুখ্যাতির স্পৃহা করিতেছ, অতএব সাধারণের উপকার করিতেও অবশ্য তোমার বাসনা আছে।" গ্লাকো, "হাঁ অবশ্য।" সক্রেটিস, "ভাল, তবে প্রথমতঃ দেশের কি উপকার করিতে বাসনা কর, ইহা বলিলে পরমাপ্যায়িত হইব।" গ্লাকো এ কথার উত্তর শীঘ্র প্রদানে অক্ষম হইয়া বলিবেন কি তাহা ভাবিতে লাগিলেন, পরে সক্রেটিস কহিলেন, "বোধ করি, তুমি স্বদেশকে ধনাঢ্য করিতে অর্থাৎ রাজস্ববৃদ্ধি করিতে মানস করিতেছ।" গ্লাকো "যথার্থ অনুমান করিয়াছ।" সক্রেটিস, "তবে বোধ করি, রাজস্ববিষয়ে তোমার বিশেষ অবগতি আছে, তাহার যথার্থ গণনা অবশ্য করিয়া থাকিবে এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার কণ্ঠাগ্রে আছে, দৈবাৎ কোন বিষয়ে উৎপত্তির ব্যাঘাত হইলে প্রকারান্তরে অপ্রতুল নিবারণের ক্ষমতাও থাকিবে।" গ্লাকো, "না এ বিষয় আমি কখন চিন্তা করি নাই।" সক্রেটিস, "তথাপি রাজ্যের ব্যয় কত, নিতান্ত পক্ষে তাহাও জান, কেননা যে যে বিষয়ে অপব্যয় হইয়া থাকে, তাহা স্থগিত করা আবশ্যক।" গ্লাকো, "ইহাও আমি জানি না।" সক্রেটিস, "তবে দেশকে

ধনাঢ্যকরণের প্রতিজ্ঞাসাধনে এক্ষণে বিলম্ব করিতে হইবে, কেননা, রাজ্যের আয় ব্যয় কত তাহাতে অবগত না হইয়া তাহা করিতে পারিবে না।"

গ্লাকো পুনশ্চ কহিল, "দেশের উপকার করিবার অন্য রাস্তা আছে, আপনি তাহার উল্লেখ করেন নাই, শত্রুগণ ধ্বংস করিয়াও রাজ্যের উপকার করা যায়।" সক্রেটিস, "যথার্থ বটে, কিন্তু রাজা বলবত্তর না হইলে শত্রুধ্বংস হইতে পারেনা, কেননা বল অল্পতর হইলে যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইতে পারে, অতএব যুদ্ধের প্রসঙ্গ করিলে উভয় পক্ষের সৈন্য গণনা করিতে হয়, রাজ্যের বল অধিক দেখিলেই যুদ্ধোদ্যোগের পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু রাজ্যের বল অল্প হইলে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত থাকিবার মন্ত্রণা দেওয়া কর্ত্তব্য। তুমি কি আমাদের রাজ্যের বল গণনা করিয়াছ? এবং জলপথে বা স্থলপথে বিপক্ষ সৈন্যের সংখ্যাও কি অবগত আছে? এ বিষয়ের কোন লিখন কি তোমার নিকটে আছে? যদি থাকে, তবে আমাকে একবার দেখাইলে বাধিত হইব।" গ্লাকো, "এক্ষণে আমার নিকট সে গণনা নাই।" সক্রেটিস, "তবে দেখিতেছি, তুমি রাজ্যভার লইলে দেশে সম্প্রতি যুদ্ধ হইবে না, কেননা এখনও তোমাকে অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক এ বিষয়ের তথ্যাতথ্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা না করিয়া তুমি কখনও যুদ্ধ করিবে না।'

সক্রেটিস এই প্রকারে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রশ্ন করিলে তাহাতেও গ্লাকোর অনভিজ্ঞতা প্রকাশ

পাইল। অবশেষে সে আপনি স্বীকার করিল যে, সেই বিষয়ের তথ্যাতথ্য না জানিয়া কেবল আত্মশ্লাঘা এবং উচ্চ-ক্ষমতা পদপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত রাজ্যশাসনের ভার লইতে উদ্যত হওয়া অত্যন্ত উপহাসের কথা। পরে সক্রেটিস কহিলেন, "হে গ্লৌকো! সাবধান হইও, যশের অত্যন্ত লোভে এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না, যাহাতে তোমার অক্ষমতা ও সামান্য বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পাইয়া তোমাকে অপ্রতিভ ও লজ্জিত করিবে।"

গ্লৌকো সক্রেটিসের সৎপরামর্শে চেতনা পাইয়া সাধারণ সভাতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে গোপনভাবে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উক্ত বৃত্তান্তে সকল কালের লোককে উপদেশ দেওয়া সর্ব্ববিধ মনুষ্যের হিতকারী হইতে পারে।

নিউটন পাঠশালা হইতে প্রত্যাগত হইলে, ইহাই স্থির হইয়াছিল, তাঁহাকে কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবেক। কিন্তু অল্প দিনেই স্পষ্ট ব্যক্ত হইল, তিনি এরূপ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে কোন অংশে সমর্থ নহেন। সর্ব্বদা এরূপ দেখা যাইত, যে সময়ে তাঁহাকে পশুরক্ষণ ও ভৃত্যদিগের তত্ত্বাবধান করিতে হইবেক, তখন তিনি নিবিষ্টমনে তরুতলে পতিত হইয়া অধ্যয়ন করিতেছেন। কখন [illegible] প্রস্তাবের আলাপে প্রবৃত্ত হইতেন; তিনি স্বসমভিব্যাহারী ভৃত্যের উপর সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া, পরিশুষ্ক তৃণরাশির উপর উপবেশনপূর্ব্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন। জননী, বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, পুনর্ব্বার আর কয়েক মাসের নিমিত্ত, তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে, ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী ট্রিনিটিনামক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অমায়িকগুণ আচরণ দ্বারা আইজাক বারো প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অনুগৃহীত ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি, কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ সাণ্ডার্সনরচিত ন্যায়শাস্ত্র, কেপ্লর প্রণীত দৃষ্টিবিজ্ঞান, ওয়ালিসলিখিত অপরিমেয়রাশিগণিত এই কয়েক গ্রন্থ পাঠ করেন; [illegible] পরিমাণসংক্রান্ত ডেকার্টরচিত রেখাগণিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন; আর, তৎকালে নক্ষত্রবিদ্যার কিছু কিছু অনুশীলন

থাকাতে, তাহারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি উই-ক্লিডের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র পাঠ করেন। এরূপ প্রসিদ্ধ আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ উত্তমরূপে পাঠ করা হয় নাই বলিয়া, উত্তর কালে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

নিউটন কেম্বিজে অধ্যয়নকালে, আলোকপদার্থের অনু-নির্ণয়ার্থ অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অনুশীলবাপী স্থিতিস্থাপক-গুণোপেত অতিবিরল পদার্থবিশেষের সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি, অন্ধকারাবৃত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহুকোণবিশিষ্ট একখণ্ড কাচ লইয়া, কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্য্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন, আলোক কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া এপ্রকার ভঙ্গুর হইয়াছে যে ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর, অসাধারণ কৌশল-পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া, তিনি এই আলোক সংক্রান্ত বিষয় নির্দ্ধারিত করিলেন—আলোকপদার্থ কিরণপুঞ্জ, ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া পৃথক করা যাইতে পারে; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে; এই ত্রিবিধ কিরণ অবস্থাভেদে ন্যূনাধিক ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই মনুষ্যের [illegible] আবিষ্ক্রিয়াকে বুদ্ধিবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলসূত্র [illegible] গণনা করিতে হইবেক।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজ নগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রদের স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। নিউটনও ঐ সময়ে স্বগ্রামস্থ আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন। তথায় পুস্তকালয়ের অসদ্ভাব প্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ পুস্তক পাঠ করিতে পারিতেন না, এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্নিধান প্রযুক্ত শাস্ত্রীয় আলাপেরও সুযোগ ছিল না, তথাপি তিনি ঐ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ভূতলাভিমুখে পতনপ্রবণতার নিয়ম প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। এই মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, নিউটনের অনধ্যায় বৎসর সকল, তাঁহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের চিরস্মরণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এক দিবস, তিনি উপবনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামকসাধারণকারণবিষয়িণী পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, তিনি এই বিষয় পুনর্ব্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণ বশতঃ আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে, এবং তাহাই পরমাদ্ভুত শক্তিসহকারে অতি সহজে সমুদয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউটন, ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজে প্রত্যাগমন করিয়া,

দিবসের পথের বিলম্বমাত্র হয়। কিন্তু রাজনগরের পথ অতি সুপথ, নদী অতিক্ষুদ্র, কোন আশঙ্কাই নাই, সকলই খাদ্য-দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, জল নির্ম্মল ও মিষ্ট। অতএব অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র।

পরন্তু ঢাকানগরের প্রাচীন-কীর্ত্তি সকল দেখিতেও যেন কেহ আলস্য না করেন।

ঢাকার মধ্যে যবনরাজাদিগের এবং বিক্রমপুরে মহারাজ বল্লালসেনের প্রাচীন কীর্ত্তির যে সকল চিহ্ন দেখা যায় তাহাতে এককালেই ঘোরতর দুঃখে দুঃখিত ও অত্যাশ্চর্য্যে অভিভূত হইতে হয়। আহা!—তাহা কি বিচিত্ররূপে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল? আমি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ঐ দুইটী বিষয়ের পুরাতন ও আধুনিক অবস্থা বর্ণনা করত সময়ক্রমে পাঠকপুঞ্জের নয়নাগ্রে সমর্পিত করিব। সংপ্রতি রাজনগর ঢাকানগর বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতির অবস্থাদর্শনে মনের অবস্থা যদ্রূপ হইল, অদ্য আন্তরিক আক্ষেপে কেবল তাহাই উল্লেখ করিলাম।

ঢাকার নবাবদিগের পুরাতন প্রাসাদ প্রভৃতি দুর্গের দুর্দ্দশাদৃষ্টে কেবল নয়ননীরে নিমগ্ন হইতে হয়। যদিও স্বস্বরূপ কিছুই নাই, তথাচ অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাই দেখিয়া নয়নের নিমিষ ফেলিতে ইচ্ছা হয় না।—আহা! কি পরিতাপ! এইক্ষণে বিক্রমপুরের সে বিক্রম নাই, সেই কীর্ত্তিকুশল পৃথ্বীপতি বিরাজমান নাই, সেই রাজবংশের সেই রাজমর্য্যাদা আর কিছুই নাই, রাজনগরের সে শোভাই নাই, কিছুই নাই, কিছুই নাই। মধুহীন মধুচক্রের ন্যায় শুষ্ক

সংবাদ ভাস্কর।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

দেশীয় ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন।

যে দেশে যে ভাষার চলন থাকে সে দেশীয় মনুষ্যদিগের সকল অভিপ্রায় সেই ভাষায় ব্যক্ত হয়, কিন্তু ঐ সকল ভাষার শব্দ অগণ্য এবং তাহার অর্থও নানা প্রকার আছে, দেশীয় লোকেরাই সকল শব্দের সকল অর্থ বুঝিতে পারেন না, অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, অতএব জ্ঞানী লোকেরা কহেন, যদি ভিন্নদেশীয় লোকেরা অপর দেশের ভাষার ব্যবহার করেন, তবে তাহার শব্দ এবং শব্দার্থ শিক্ষায় বিলক্ষণ মনোযোগ করিবেন। কারণ আপনারা শব্দবোধে অনভিজ্ঞ হইলে, অন্যের নিকট এক শব্দ অন্য প্রকার বলিবার সম্ভাবনা, এবং শব্দার্থ না জানিলে এক শব্দের অর্থ অন্যরূপে বলেন, তাহাতে শ্রোতারা এক বিষয় অন্য প্রকার বুঝিয়া যদ্যপি বিপরীত ব্যবহার করেন, তবে অনিষ্টসম্ভাবনাও আছে, ইহার এক উদাহরণ বলি মনোযোগ কর।

ঢাকা নগরে মাধবদাস নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন, তিনি প্রথমাবস্থায় যুদ্ধশিক্ষা করিয়া অস্ত্র শস্ত্র চালনে নিপুণ হইলেন, এবং ঐ বিদ্যার প্রভাবেই অনেক রাজ্য হস্তগত করিলেন, তৎপরে যখন দেখিলেন, রাজ্যশাসন বিষয়ে অভিলাষের শেষ হইয়াছে, তখন কমলপুর নামক সুশোভিত রাজধানীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এই সময়ে ঢাকা নগর হইতে মাধবদাসের আত্মীয় পরিবারাদির আগমন হইল এবং জ্ঞাতিকুটুম্বেরাও ক্রমে কমলপুরে আইলেন। অন-

ন্তর এক দিবস মাধবদাসের গুরু পুরোহিতএকত্র হইয়া পরা-
মর্শ করিলেন, মাধবদাস কমলপুরে রাজা হইয়াছেন, তাঁহার
আত্মীয় পরিবার জ্ঞাতি কুটুম্বেরাও সেই স্থানে গেলেন, তবে
আমরা খানা নগরে কি জন্যে রহিলাম, চল কমলপুরে
গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, তিনি অবশ্য
আমাদিগকেও নিকটে রাখিবেন। এই পরামর্শ করিয়া গুরু
পুরোহিত কমলপুরে গমন করিলেন, কিন্তু তৎকালীন মাধব-
দাসের দ্বারে অনেক দ্বারী ছিল, তাহারা বিদেশীয় লোক,
সংস্কৃত ভাষার কিছুই জানে না, তথাচ ঐ গুরু পুরোহিত
সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন, "রাজাকে সমাচার দেও, খানানগর
হইতে গুরু পুরোহিত আসিয়াছেন।" দৌবারিকদিগের
নিকট বারবার এই কথা বলেন, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে
না, অতএব দৌবারিকেরা মহা বিরক্ত হইয়া ভাবিতে
লাগিল, রাজার নিকট সমাচার না দিলে তাহাদিগের দণ্ড
হইবে, অতএব এক ব্যক্তি ঐ কথা শুনিয়া রাজসমীপে
কহিতে গেল, কিন্তু যাইতে যাইতে আনুপূর্ব্বিক ভুলিয়া গিয়া
হিন্দী ভাষায় কহিল, মহারাজ গুকনগর হইতে খানা আসি-
য়াছে, কি আজ্ঞা হয়। রাজা ভাবিলেন তাঁহার এক গ্রামের
নাম গুকনগর বটে সেই স্থান হইতে খানা আসিয়া থাকিবে,
অতএব কহিলেন, খানা নিয়া গোলায় রাখ, পরে বিবেচনা
হইবে। এই কথা শ্রবণে দৌবারিক নীচে গিয়া কহিল,
তোমারদিগকে গোলায় রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, চল, সেই
স্থানে রাখিয়া আসি, তাহাতে গুরু পুরোহিত ভাবিলেন,
গোলা নামে কোন উত্তম গৃহ আছে, সেই স্থানে আমাদিগকে

লইয়া যাইতেছে, ইহার পরে রাজা [illegible] সাক্ষাৎ করি-
লেন, এবং গোলার কপাটি খুলিয়া মধ্যে ধান্যের উপর
বসাইয়া [illegible] এ লোকেরা [illegible]
ধান্যের [illegible] গুরু পুরোহিত [illegible]
প্রথমতঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বসাইতে হয়, এই কহিয়া [illegible]
গোলায় লইয়া গেলেন। [illegible]
চলিয়া গেল, পশ্চাৎ [illegible]
উঁহারা মনে করিলেন আমাদিগের [illegible]
ঘটিয়াছে, নতুবা মাধবদাস যথার্থ [illegible] পারিবেন [illegible]
একপ হইত না; অতএব গুরু পুরোহিত [illegible] তিন জনে
মহা কোলাহল চীৎকার করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতেও
দৌবারিকেরা কপাটি খুলিয়া দিলেক না, বরং বাহিরে
থাকিয়া আরো তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। পরে ঐ
কোলাহল রাজার কর্ণগোচর হইল যে, ধান্যের গোলায়
লোক বদ্ধ রহিয়াছেন, অতএব রাজা দৌবারিকগণকে
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ধান্যের গোলার মধ্যে কেন
গোলমাল হইতেছে? তাহাতে দৌবারিক কহিল, আমি
তখন বলিয়াছি গুরুপুর হইতে ধান্য আসিয়াছে, কি আজ্ঞা
হয়, তাহাতে মহারাজ ধান্য গোলাতে রাখিতে অনুমতি করি-
য়াছিলেন, তাহাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়াছি, এইক্ষণে
তাহারাই চীৎকার করিতেছে। ইহাতে রাজা কহিলেন, ওরে
মূর্খ! এ যে মনুষ্যের চীৎকার শুনিতেছি, ধান্য কি মনুষ্যের
ন্যায় চীৎকার করিতে পারে? কেমন ধান্য রাখিয়াছিস,
এই স্থানে লইয়া আয়, বিবেচনা করি। তৎপরে দৌবারিক

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সক্রেটিসের উপদেশ দিবার বৃত্তান্ত।

সক্রেটিসের চরিত্র কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া তিনি সাধারণের বিশেষতঃ স্বদেশীয় যুবকদের উপদেশার্থে কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এক্ষণে লেখা যাইতেছে, কেন না তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দেওয়াতেই তাঁহার নাম প্রকৃতরূপে উজ্জ্বল হয়।

লিবেনিয়স* কহিয়াছেন যে তিনি স্বদেশী লোকের সুখ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত এমত উদ্যোগী ছিলেন যে, জন সাধারণে তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত। কিন্তু বৃদ্ধলোকদের ব্যবহারশোধন দুষ্কর, কেন না যাহারা আজন্মকাল মিথ্যাজ্ঞানের বিড়ম্বনায় প্রবীণ হয়, তাহারা পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ করিয়া সহজে নূতন মত গ্রহণ করিতে পারে না, একারণ তিনি যুবকদের শিক্ষাতেই বিশেষ যত্নবান হয়েন, ফলতঃ উর্ব্বরা ভূমিতেই ধর্ম্মের বীজ রোপণ করা পরামর্শসিদ্ধ।

অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিতেরদের ন্যায় সক্রেটীসের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকাশ্য পাঠশালা ছিল না, এবং শিক্ষা দিবারও নিয়মিত কাল ছিল না, তিনি ছাত্রবর্গের সঙ্গে বেড়ান প্রভৃতি

---

* লিবেনিয়স—এক জন গ্রীসদেশীয় আলঙ্কারিক। ৩২৪ খৃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

বিশেষ উপদেশার্থ প্রস্তুত করেন নাই, এবং আপনিও অধ্যাপনার কোন প্রশস্ত আসন গ্রহণ করিতেন না, উপদেশের দেশ কাল পক্ষে কোন নিয়ম ছিল না, সকল স্থানে, সকল কালেই এবং রণস্থল, শিবির, রাজকীয় সমাজ, কারাগারাদি সকল স্থানেই বিদ্যাবিতরণের যত্ন প্রকাশ করিতেন। প্লুটার্ক† কহেন "অবশেষে বিষপানকালীনও শিষ্যদিগকে জ্ঞানের কথা বিস্তারকরণে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার এই ব্যবহারের প্রসঙ্গে বিচক্ষণ গ্রন্থকর্ত্তা রাজনীতিবিষয়ক এক উত্তম নিয়মের বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "স্বদেশের উপকারকরণার্থে রাজকার্য্যে বাস্তবিক নিযুক্ত হওয়া, অথবা বিবাদনিষ্পত্তির নিমিত্ত বিচারকের পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চতর বিচারাসনে উপবিষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক নহে, অনেকে এ প্রকার পদ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাহারা সেনেটর বক্তা ইত্যাদি সুচারু উপাধি প্রাপ্ত হইলেও যদি তৎসম্বন্ধীয় ধর্ম্মে ও কার্য্যসাধনে তৎপর না হয়, তবে তাহাদিগকে সামান্য লোক মাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, এমত লোককে বরং পামর ও ইতর জনতামধ্যে গণ্য করাতে হানি নাই। যে ব্যক্তি পৃষ্ট হইলে সৎপরামর্শ দানে সমর্থ, এবং পৌরজনগণকে ধর্ম্মানুসারী ও দয়াসত্যন্যায়ানুরাগী এবং স্বদেশীয় হিতার্থে যত্নশালী করিতে যাহার ক্ষমতা আছে, সে ব্যক্তি যেমত পদ কিম্বা অবস্থাতে থাকুক, তাহাকেই সত্যবিচারক ও সত্যশাসক কহিতে হয়।"

সক্রেটিসও এই প্রকার লোক ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা পুরুষ-

† এক জন গ্রীসদেশীয় জীবনবৃত্তরচয়িতা।

দিগকে হিতোপদেশ দ্বারা সংশোধন করিয়া রাজ্যের কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছিলেন,তাহার বর্ণনাতে লেখনী সমর্থা হয় না। কোন উপদেশক তাঁহাপেক্ষা অধিক শিষ্যকে একত্র করিতে কখন পারে নাই, আর তাঁহার ন্যায় অন্য কাহারও শিষ্য মনোজ্ঞ ছিল না। প্লেটো* একদা কহিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বকালে এই বলিয়া করুণানিধান ঈশ্বরের স্তব করিয়াছিলেন যে, বিবেকশক্তিবিশিষ্ট জীব হইয়া এক ভূমিতে না জন্মিয়া গ্রীসদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অন্যকালে সংসারযাত্রা না করিয়া সক্রেটিসের পবিত্র জীবনকালে জন্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন. অতএব বিধাতাকে ধন্যা জেনফনও† তাঁহার উপদেশে কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে সক্রেটিস তাঁহাকে এক দিন রাজমার্গে দেখিয়া যষ্টিনোদন দ্বারা দুর্গম করত জিজ্ঞাসা করেন, "খাদ্যদ্রব্য কোথায় বিক্রয় হয়, তাহা জান?" জেনফন হট্টের পথ দেখাইয়া এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই দিয়াছিলেন, পরে সক্রেটিস পুনশ্চ জিজ্ঞাসিলেন "সুনীতির শিক্ষা কোথায় পাওয়া যায়?" এ কথার জেনফন কোনরূপ নিরুত্তর হইলে ঐ পণ্ডিত স্বয়ং কহিলেন, "সুনীতিশিক্ষার স্থল যদি জানিতে চাহ, তবে আমার সহিত আইস, আমি দেখাইব।" জেনফন তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত গমন করিলেন। পরে ঐ

---

* প্লেটো—এক জন গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক। ইনি সক্রেটিসের অন্যতম শিষ্য।

† এক জন গ্রীসদেশীয় ইতিহাসরচয়িতা।

জেনফন সর্ব্বাগ্রে গুরুর উপদেশ সংগ্রহ করিয়া লোক-শিক্ষার্থ প্রকাশ করেন।

আরিষ্টিপস * একবার সক্রেটিসের কথা সংক্ষিপ্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকারে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে ঐ জ্ঞানীর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত [illegible] এবং অনর্থনিরসনের পথলাভের চিন্তায় শারীরিক [illegible] হইয়াছিলেন, পরে তদুপদেশ শ্রবণ করিয়া চক্ষু সফল করিয়াছিলেন।

মেগারা দেশীয় ইউক্লিডের বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে আরো স্পষ্ট বোধ হয় যে, সক্রেটিসের শিষ্যেরা তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত্যর্থে কি পর্য্যন্ত ব্যগ্র হইত। এথেন্স এবং মেগারাদেশীয় লোকদের মধ্যে যে সময়ে [illegible] সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে উভয় দলস্থ লোকের পরস্পর এরূপ দ্বেষ ও হিংসা জন্মিয়াছিল যে এথেন্স নগরের পৌরজনেরা নিজ সেনানীগণকে বৎসর বৎসর দুইবার মেগারা রাজ্যে উপদ্রব করিতে শপথ করাইয়াছিল, এবং নিয়ম করিয়াছিল যে, শত্রুপক্ষের কেহ আটিকাদেশে পদার্পণ করিলেই শমনভবন গত হইবে! তথাপি সক্রেটিসের উপদেশ শ্রবণার্থে ইউক্লিডের মনোবাসনা শিথিল হয় নাই। তিনি সায়ংকালে মুখে অবগুণ্ঠন দিয়া নারীর বেশে সক্রেটিসের বাটীতে আসিতেন, পরে রাত্রি প্রভাত করিয়া প্রত্যূষে পুনশ্চ ঐরূপে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন।

সক্রেটিসের শিষ্য হওনার্থে এথেন্স নগরীয় সভ্য লোক-

* একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক। সক্রেটিসের শিষ্য।

যুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা, করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল, মা! এ কে, এ দেখে তুই কাঁদিস কেন? তখন শকুন্তলা গদগদবচনে কহিলেন বাছা! এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাজা মনের আবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননা করিয়া তোমায় বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই, আমার সকল বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল; তদবধি আমি কি অসুখে কালহরণ করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাইব আমার সে আশা ছিল না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

রাজা এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা অত্যন্ত ব্যস্ত রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! উঠ উঠ তোমার দোষ কি, আমার অদৃষ্টের দোষ। এত দিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! প্রত্যাখ্যানকালে তোমার নয়নযুগল হইতে যে জল-

সীতার বনবাস।

পর দিন প্রভাতে রথ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইল। ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া, সীতাকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবেক, এই ভাবিয়া লক্ষ্মণের শোকজলের অনিবার্য্যবেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি তাহার বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সীতা দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! কি কারণে তোমার এরূপ ভাব উপস্থিত হইল, বল। তখন লক্ষ্মণ, নয়নের অশ্রুসম্বরণ করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না, বহু কালের পর ভাগীরথী-দর্শন করিয়া, আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কপিলশাপে ভস্মাবশেষ হইয়াছিলেন; ভগীরথ কত কষ্টে, গঙ্গাদেবীকে ভূমণ্ডলে আনিয়া, তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন; বোধ হয়, তাহাই ভাগীরথীদর্শনে স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, এরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সীতা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা ও নিতান্ত সরলহৃদয়া, লক্ষ্মণের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্যোগ করিতে কহিতে লাগিলেন; কিন্তু গঙ্গা পার হইলেই যে এ জন্মের মত দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই তরণীসংযোগ হইল। লক্ষ্মণ, সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ স্থাপন করিতে কহিয়া, সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই তাঁহারে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া, তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্যে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমার কিছু বক্তব্য আছে, এই স্থানে নিবেদন করিব। এই বলিয়া, তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সীতা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া, এত আকুল হইলে কেন? কি বলিবে ত্বরায় বল; তোমার ভাবান্তর দেখিয়া আমার চিত্ত একান্ত অস্থির হইতেছে, যাহা বলিবে ত্বরায় বল, আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। তুমি কি অযোধ্যার সমস্ত ও আর্য্যপুত্রের কোন অশুভ ঘটনা শুনিয়া আসিয়াছ, না আমার কোনরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে? কি হইয়াছে, শীঘ্র বল। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! বলিব কি, আমার মুখে বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না; আর্য্যের আজ্ঞাবহ হইয়া আপনার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। [illegible] ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে, এ পাপীর সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম; যদি মৃত্যু অপেক্ষা কোন অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল; তাহা হইলে আমি আমার আর্য্যের দুর্ব্বিষহ আদেশ প্রতিপালন করিতে হইত না। হা বিধাতঃ!

আমার অদৃষ্টে এই ছিল! এই বলিয়া, উন্মূলিত তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইয়া, লক্ষ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতা, লক্ষ্মণের ঈদৃশ অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর অবলোকন করিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর, হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অঞ্চল দ্বারা তদীয় নয়নের জলমার্জ্জন করিয়া দিলেন; এবং তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, কাতরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কি কারণে তুমি এত ব্যাকুল হইলে? কি জন্যেই বা তুমি আপনার মৃত্যুকামনা করিলে? তোমায় একান্ত বিকলচিত্ত দেখিতেছি; অল্প কারণে তুমি কখনই এত আকুল ও অস্থির হও নাই। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? যেন ওষ্ঠাগতপ্রাণ, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে! আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই জন্যেই কল্য অপরাহ্ণে আমার তাদৃশ চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল। যাহা হয়, ত্বরায় বলিয়া, আমার জীবন দান কর, আমার যাতনার একশেষ হইতেছে। ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, আমারই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; না হইলে, এমন সময়ে তুমি এত ব্যাকুল হইতে না।

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দেখিয়া, লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্যনিঃসরণ রহিত হইয়া গেল। যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, অবশেষে অবশ্যই বলিতে হইবেক, এই ভাবিয়া লক্ষ্মণ বলি-

কিনী রাবণগৃহে ছিলেন, সেই কারণে পৌরগণ ও জানপদবর্গ, আপনকার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়া, অপবাদঘোষণা করিয়া থাকে। আর্য্য তাহা শুনিয়া একবারে স্নেহ, দয়া ও মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া অপবাদবিমোচনার্থে আপনারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমায় এই আদেশ দিয়াছেন, তুমি তপোবনদর্শনচ্ছলে লইয়া গিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাও শ্রবণমাত্র হতচেতনা হয়, বাতাহতা কদলীর ন্যায়, ভূতলশায়িনী হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি অনেক যত্নে জানকীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনা লাভ করিয়া, উন্মত্তার ন্যায় স্থিরনয়নে লক্ষ্মণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, হতবুদ্ধির ন্যায়, চিত্রার্পিতপ্রায়, অধোবদনে গলদশ্রু নয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ, যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহার কিছুই বুঝিতে না পাইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে পর, সীতা চিত্তের

সময়ে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, সে কেবল আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ। বৎস! আমি বনবাসে কাতর নহি। আর্য্যপুত্রের সহবাসে এত কাল বনবাসে ছিলাম, তাহাতে এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। আর্য্যপুত্রসহবাসে যাবজ্জীবন বনবাসে থাকিলেও, আমার কিছু মাত্র অসুখ হইত না। সে যা হউক, আমার অন্তঃকরণে এই দুঃখ হইতেছে, আর্য্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব। তাঁহারা আর্য্যপুত্রকে করুণাসাগর বলিয়া জানেন, আমি প্রকৃত কারণ কহিলে, তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না; তাঁহারা অবশ্যই ভাবিবেন, আমি কোন ঘোরতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, এই মুহূর্ত্তে তোমার সমক্ষে জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার জীবনধারণের ফল কি বল? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয়? আমি এই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি আর্য্যপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও আমার প্রাণত্যাগ হইল না। বোধ করি, আমার মত কঠিন প্রাণ আর কারও নাই, নতুবা এখনও নির্গত হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা আমায় চিরদুঃখিনী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, প্রাণত্যাগ হইলে তাঁহার সে সঙ্কল্প বিফল হইয়া যায়, এ জন্যই জীবিত রহিয়াছি।

বিধবা বিবাহ।

এই সমস্ত দেশাচার শাস্ত্রমূলক বলিয়া পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল; পরে অন্য শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের অন্য ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হওয়াতে তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন আচার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যদি এই সকল স্থলে নূতন শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা দেখিয়া পূর্ব্ব-প্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে যে নূতন নূতন আচার প্রচলিত হইয়াছে আপনারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন তবে হতভাগা বিধবাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রদানে এত কাতরতা ও এত কৃপণতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন? বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রস্তাবিত বিষয় পূর্ব্বোক্ত কয়েক বিষয় অপেক্ষা সহস্র অংশে গুরুতর। দেখুন যদি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ না করিতেন এবং পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক গৃহীত হইলে দত্তক পুত্র সিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে লোকসমাজের কোন অংশে কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত না থাকাতে যে শত শত ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা আপনারা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আপনারা ইতিপূর্ব্বে কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে অবলম্বিত নূতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে যখন শাস্ত্র পাইতেছেন এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয় স্পষ্ট বুঝিতেছেন, তখন

বিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে, যখন রাজবিপ্লব ঘটে, কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের প্রতিরূপ হইয়া, পার্লিমেণ্ট নামক সমাজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, সকলে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিল; এবং ১৭০১ খৃঃ অব্দেও ঐ সদস্যের পদ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির সহায় উপকার ও পুরস্কার করিবার ক্ষমতা ছিল, নিউটনের অসাধারণ গুণ তাঁহাদের গোচর হওয়াতে, তিনি তদীয় আনুকূল্যবলে টাকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধানবিষয়ে অসাধারণ ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ঐ পদের উপযুক্ত ছিলেন। নিউটন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বত্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর, নিউটন বহুতর প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। লিবনিজ নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নিউটনের নব নব আবিষ্ক্রিয়া নিবন্ধন অসাধারণ সম্মান-দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া, তদ্বিলোপবাসনায় তাঁহার নিকট এক প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, নিউটন কোন রূপেই ইহার সমাধান করিতে পারিবেন না; তাহা হইলেই তাঁহার প্রাধান্য প্রতিহত হইবেক। নিউটন টাকশালের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সায়াহ্নে ঐ প্রশ্ন পাইলেন এবং শয়নের পূর্ব্বেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিলেন। তৎপরে আর কোন ব্যক্তি কখন নিউটনের কীর্ত্তিবিলোপের চেষ্টা করেন নাই। ১৭০৫ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডেশ্বরী অ্যান, নিউটনের মানবর্দ্ধনার্থে, তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন।

বয়সে ভূমণ্ডলে সাধারণগুরু হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অসহ্য দৈহিক যন্ত্রণা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতাপ্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর, ১৭২৭ খৃঃ অব্দের ২০ শে মার্চ্চ, চতুরশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময়ে, তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র অন্য অন্য লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে, চরিত্রাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর, যে উপায়ে তিনি মনুষ্যমণ্ডলীতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে মহোপকার ও যথার্থলাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয়জীবনবৃত্তপাঠে পদে পদে উপদেশলাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুগণের কক্ষ, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ এই দুই পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই বিষয় কোন ব্যক্তির মনেও উদিত হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতাসহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর তাঁহার সমুদয় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্তার মহিমা, প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈদৃশলোকোত্তরবুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি স্বভাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা

ধরাতলে জ্ঞানকণা আছে, আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

শকুন্তলা।

রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলন।

এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, রাজা শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু, সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া, অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া, রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তপোবনের কি অনির্বচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর অত্যাচার করিতেছে, সিংহশিশু অবিকৃতচিত্তে সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অনন্তর কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া, সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া, স্নেহরসপরিপূর্ণ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, আপন ঔরস পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা আমি পুত্রহীন বলিয়া, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া আমার মনে এরূপ প্রগাঢ় স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।

এদিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি, তুমি কেন অকারণে উহারে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর যদি তুমি উহারে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমায় দণ্ড করিবেক। বালক শুনিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া, সিংহশাবকের উপর পূর্ব্বা-

খেলায় সিংহশিশুর উপদ্রব আরম্ভ করিল, তাপসীরা, ভয়-প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া, প্রলোভ-নার্থে কহিলেন, বৎস! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমায় একটি ভাল খেলানা দিব।

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া, তাহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সহসা তাহাদের সম্মুখে না আসিয়া এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া অনিমিষনয়নে সেই শিশুকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই বালক, কই কি খেলানা দিবে, দাও বলিয়া হস্তপ্রসারণ করিল। রাজা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, চমৎকৃত হইয়া মনে-মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে! তাপসী-দিগের সঙ্গে কোন খেলানা ছিল না, সুতরাং তাঁহারা তৎ-ক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক কুপিত হইয়া কহিল, তোমরা খেলানা দিলে না, তবে আমি উহারে ছাড়িব না। তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন, সখি! ও কথায় ভুলিবার ছেলে নয়; কুটীরে মাটির ময়ূর আছে, শীঘ্র লইয়া আইস। তাপসী তৎক্ষণাৎ ময়ূরের আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া, রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে! পরের পুত্র দেখিলে

মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যে ব্যক্তির এই পুত্র, সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখ-চুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধবিনির্গত কুন্দসন্নিভ দন্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য; সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া সর্ব্বশরীর শীতল করিব; পুত্রের অর্দ্ধবিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করিয়া, নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব; এবং অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরাশ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্মূল হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া, কুপিত হইয়া ঐ বালক বলিল এখনও ময়ূর দিলে না, তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া সিংহশিশুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাহার হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এমন সময়ে এখানে কোন ঋষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র, রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহি-লেন মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সিংহশিশুকে এই বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজা, তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া সেই বালককে ঋষিপুত্রবোধে সম্বোধন

আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করা আপনাদিগের কোন মতেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন ততই মঙ্গল। বস্তুতঃ দেশাচারের দোহাই দিয়া আর আপনাদিগের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা অনুচিত। কিন্তু এখনও আমার আশঙ্কা হইতেছে যে আপনাদিগের মধ্যে অনেকে দেশাচার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াও পাতিত্যজনক জ্ঞান করিবেন এবং অনেকে মনে মনে সম্মত হইয়াও কেবল দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত এ কথা সাহস করিয়া মুখেও বলিতে পারিবেন না। হায় কি আক্ষেপের বিষয় দেশাচারই এ দেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা, দেশাচারই এ দেশের পরম গুরু। দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের প্রচার রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া

অবলোকন করিলে, অধোদিগে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ ক্রোশ উপরের বায়ু অতি স্বচ্ছ ও পরিশুষ্ক; তথায় মেঘ ও বাষ্প লেশমাত্রও নাই।

মেঘের উৎপত্তি, বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বের উপর নির্ভর করে। জল যত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে ততই বাষ্প উঠিতে থাকে। এ নিমিত্ত প্রখর রৌদ্রের সময় অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অধিক দূর উত্থিত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে, অতএব চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ সমূহ বাষ্প রাশি আকাশমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে এবং যদি কোন দিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে, ঐ সকল বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ জন্মায়। এইরূপ অন্য অন্য কারণেও বায়ুর উষ্ণতা হ্রাস ও শৈত্য বৃদ্ধি হইয়া মেঘ উৎপাদন করে। দিবাবসান-কালে বায়ুর উত্তাপ ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে; এই নিমিত্ত সে সময়ে সতত মেঘ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উপরিস্থিত বায়ু অধঃস্থিত বায়ু অপেক্ষায় শীতল; এই হেতু যে সমস্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, তাহা উপরে উঠিয়া ঘন হইয়া মেঘ জন্মায়।

উপরে প্রতিক্ষণ নানা দিকে নানাপ্রকার বায়ু প্রবাহ বহিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মেঘ সমুদায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অশেষ বিধ, অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এক নিমিষের নিমিত্তে ও স্থির নহে, সর্ব্বদাই তাহাদের কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। অধুনা জলীয়

বাষ্পের সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হইলে, যেমন সেই বাষ্প ঘন হইয়া মেঘ উৎপাদন করে, সেইরূপ আবার উৎপাদিত মেঘে উষ্ণ বায়ু লাগিলে, সেই মেঘ বিশ্লিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এক এক খান মেঘ উঠিতে উঠিতে যে অন্তর্হিত হইতে দেখা যায় তাহার কারণ এই।

সমুদায় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল কণা-সমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া অশেষ প্রকার মনোহর বর্ণ উৎপাদন করে। সূর্য্য-কিরণে নীল, পীত, লোহিত, হরিত, পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণ আছে। বহু-কোণ বিশিষ্ট কাচে ও অন্য অন্য কোন কোন বস্তুতে সূর্য্য কিরণ পাতিত করিয়া ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখান যায়। দেলোয়ারি ঝাড়ের কলমে রৌদ্রের আভা পতিত হইয়া যে নানাবিধ বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। গগনমণ্ডলস্থ মেঘাবলির বিচিত্র বর্ণও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর এই কয়েক বর্ণের মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়; শ্বেত,পীত,লোহিত, পিঙ্গল ও ধূসর। হরিত-বর্ণ মেঘও পরম সুদৃশ্য কিন্তু অতি বিরল। সায়ংকালীন জলদজালের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়।

রামধনুর পরম সুন্দর শোভাও ঐ রূপে সমুদ্ভূত হয়। উল্লিখিত বহু-কোণ কাচের ন্যায়, বৃষ্টি-কালীন জল-কণা-সমূহে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলেও তাহার অন্তর্বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন কিরণ-জাল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক একটী জল-কণা এক এক খানি বহুকোণ কাচ স্বরূপ। বহুসংখ্যক

জলবিন্দু একত্র হইয়া রামধনু উৎপাদন করে। মনোযোগের যে ভাগে শস্য-মণ্ডল অবস্থিত থাকে, তাহার বিপরীত ... রামধনু দৃষ্ট হয়। সূর্য্য কিরণের ন্যায় চন্দ্র-কিরণেও ... উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু চান্দ্র রামধনুর বর্ণ সৌর রামধনুর তুল্যরূপ উজ্জ্বল নহে। লোকে উহাকে রামধনু ও ইন্দ্রধনু উভয়ই বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা কাহারও ধনু নহে। জলকণা সমূহে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া এই রূপ মনোহর আকার উৎপন্ন হয়। যিনি এই আকাশ... আছেন ... কার্য্যের সর্ব্বত্র ... সুললিত সৌন্দর্য্যসুধা বর্ষণ করিয়াছেন, ... তাঁহারই আনর্ব্বচনীয় ... প্রকাশ পাইতেছে।

মেঘ কেবল ক্ষুদ্র জলকণা ব্যতিরেকে যে আর কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ জন্মায়, সেইরূপ মেঘ শীতল হইলে তাহার অণু সমুদায় ঘন হইয়া জল হইয়া পড়ে। যে মেঘের ভার যে স্থানের বায়ুর ভারের সমান, সেই মেঘ সেই স্থানে অবস্থিত থাকে। পরে কোন হেতুবশতঃ শীতল হইলেই, ঘনীভূত ও ভারাক্রান্ত হইয়া জলধারা রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়, ইহাকেই বৃষ্টি কহে। অতএব বৃষ্টির নিয়ম অতি সহজ। ইহা জানিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।

সমুদ্র ও জলাভূমি হইতে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়। এই নিমিত্তই সেই সেই স্থানে ও তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বতশিখর অপেক্ষাকৃত শীতল;

অতএব যে সকল মেঘ চলিতে চলিতে পর্ব্বতশিখরে গিয়া অবস্থিত হয়, তাহা শীতে ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পর্ব্বতেও অধিক পরিমাণে জলবর্ষণ হইয়া থাকে। যে পর্ব্বত সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ষণ হয়, এবং যে পর্ব্বত সমুদ্রতট হইতে দূরবর্ত্তী, তাহাতে তদপেক্ষা অল্পতর বৃষ্টিপাত হয়।

বায়ু প্রবাহের ইতর বিশেষ দ্বারা বৃষ্টিপাতেরও অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, এ নিমিত্ত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ প্রভৃতি যে কয়েক মাস দক্ষিণ দিক অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম কোন হইতে বায়ু বহিতে থাকে, সেই সেই মাসে উল্লিখিত সমুদ্র হইতে উৎপন্ন মেঘ সমুদায় ঐ বায়ু সহকারে সঞ্চারিত হইয়া ভারতভূমির উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করে। এই প্রবল বায়ু কয়েক মাস প্রবাহিত থাকাতে ভারতবর্ষের বর্ষাকাল, শীত বসন্ত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ন্যায়, এক স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ইংলণ্ডে ও তাদৃশ অন্য অন্য প্রদেশে এরূপ স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু নির্দ্দিষ্ট নাই; সে সকল স্থানে বার মাসই বৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের উত্তর দিকে মেঘোৎপত্তির উপায় নাই। এই নিমিত্ত এতদ্দেশে কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ বায়ু নিবৃত্ত হইয়া উত্তরীয় বায়ু আরব্ধ হইলে, জলবর্ষণও এক প্রকার নিবৃত্ত হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অর্থাৎ দক্ষিণা-পথের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ তিন দিকেই সমুদ্র। এ নিমিত্ত যে সময়ে পশ্চিম দক্ষিণ কোন হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন দক্ষিণা-

পদের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে, অর্থাৎ মলয়বর দেশে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, এবং যখন পূর্ব্বোত্তর হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে, অর্থাৎ চোল-মণ্ডল নামক উপকূলে আসিয়া মেঘ ও বৃষ্টি উপস্থিত করে।

পর্ব্বতাদি দ্বারা বায়ুর প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত হওয়াতেও বৃষ্টি পাতের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে বায়ু প্রবাহ দ্বারা বাষ্প রাশি আনীত হইয়া ভারতবর্ষে পূর্ব্বোত্তর ভাগে মেঘ সঞ্চারিত ও বারি বর্ষিত হয়, তাহা প্রথমতঃ পশ্চিম দক্ষিণ হইতে বঙ্গীয় অখাতের উপর দিয়া বাহিত হয়। পরে যখন হিমালয়ও তৎসংলগ্নিহিত দক্ষিণ দিকস্থ পর্ব্বতের নিকট উপনীত হইয়া তদ্দ্বারা প্রতিহত হয়, তখন আর উত্তরাংশে গমন করিতে না পারিয়া পশ্চিমোত্তর ভাগে চলিতে থাকে। পশ্চিমোত্তর ভাগে বহিতে বহিতে যখন হিন্দুকোষ নামক পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন তদ্দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রকারে সুলিমান নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া তদ্দ্বারা পুনরায় প্রতিহত হইয়া অন্য দিকে সঞ্চরণ করে।

যে সমস্ত মেঘ ও বাষ্প উল্লিখিত বায়ু প্রবাহ দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহা হিমালয়ের উত্তরাংশে গমন করিতে পারে না। হিমালয় কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া বারি বর্ষণপূর্ব্বক গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি অনেক অনেক নদীর জল বৃদ্ধি করে, ও সেই সমস্ত নদীর তীরস্থ ভূমি জলে প্লাবিত করিয়া উর্ব্বরা করিতে থাকে ঐ বায়ু হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া

তাহার উত্তর দিকে মেঘ ও বাষ্প সঞ্চালন করিতে পারে না এ নিমিত্ত জলাভাবে সেই প্রদেশ মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে।

যদি কোন পর্বতময় প্রদেশ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা হইলে, তত্রত্য মেঘ সমুদায় সেই বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া অন্য অন্য নিম্ন স্থানে গিয়া বর্ষণ করে। যদি সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়, তাহা হইলে, ঐ মেঘ ঘনীভূত না হইয়া আরও লঘু হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এই কারণে ইউরোপের দক্ষিণ পার্শ্ব-বর্ত্তী ভূমধ্য সাগর হইতে যে সমস্ত বাষ্প-রাশি উৎপন্ন হইয়া মিশর দেশের উপর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, তাহা উল্লিখিত মিশর দেশের উপরে ঘনীভূত ও বর্ষিত না হইয়া উত্তরোত্তর দক্ষিণ দিকেই চলিয়া যায়। পরে যখন আবিসিনিয়ার পর্বতময় উন্নত প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন জল হইয়া বর্ষিত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত মিশর দেশে সর্ব্বদাই অনাবৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে মূলেই বৃষ্টি হয় না, অন্য অন্য সময়েও অতি অল্প। বিশেষতঃ, তাহার দক্ষিণখণ্ডে জল-বর্ষণ অতি অসামান্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত আছে। তত্রত্য লোক বৃষ্টি ব্যতিরেকে কি রূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, বিবেচনা করিতে হইলে, আপাততঃ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়া তাহাদের অনাবৃষ্টি ঘটিত অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা একবারে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় যেমন যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় না, তেমন গ্রীষ্মকালে এরূপ শিশির-বর্ষণ হয়, যে তথাকার মৃত্তিকা তাহাতে আর্দ্র হইয়া বিলক্ষণ

উর্দ্ধদিকে উঠিয়া উঠে। তদ্ভিন্ন, তথায় নীল নামে এক নদী আছে; তাহা গঙ্গা নদীর ন্যায় প্রতিবর্ষে বৃদ্ধি হইয়া উভয় তটকে কয়েক মাস জলে প্লাবিত করিয়া রাখে। এজন্যে ঐ উভয় তীরস্থ ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরশালিনী হইয়া অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করে।

সৌর জগৎ।

আপাততঃ বোধ হয়, পৃথিবী এক স্থানে স্থির হইয়া আছে, আর সূর্য্য তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। জ্যোতিঃশাস্ত্র পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন সূর্য্যমণ্ডল, বুধ, শুক্র পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণের মধ্যবর্ত্তী; গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। সূর্য্য নিজে গ্রহ নহে, যাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এইরূপ পরিভ্রমণ করে, তাহাদেরই নাম গ্রহ। আমাদের অধিষ্ঠান ভূতা পৃথিবীও সূর্য্যকে এইরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে; অত-এব পৃথিবীও এক গ্রহ।

সমুদায় কত গ্রহ আছে, নিশ্চয় বলা যায় না; এ পর্য্যন্ত ১১৪ এক শত চৌদ্দটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্য অন্য গ্রহ অপেক্ষায় বুধ গ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, তাহার পর শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, হর্শেল ও নেপ্চুন গ্রহ যথাক্রমে সূর্য্য মণ্ডলের নিকট হইতে উত্তরোত্তর অধিক দূরে অবস্থিত রহিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে বল্কান নামে আর একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা সূর্য্য মণ্ডল ও পৃথিবী মণ্ডলের মধ্যে কোন স্থানে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। উল্লিখিত প্রধান নয় গ্রহ ব্যতিরিক্ত ফ্লোরা, ভিক্টোরিয়া, বেষ্টা, আইরিস, মীটিস, হীবি, পার্থেনোপি, অষ্ট্রিয়া, ইজীরিয়া, ইউনোমিয়া, যুনো, সীরিস, পালাস, হাইজীয়া প্রভৃতি ১০৫ একশত পাঁচটী ক্ষুদ্রতর গ্রহ, মঙ্গল ও বৃহস্পতির ভ্রমণ-পথের মধ্যস্থলে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। ইহারা পূর্ব্বোক্ত প্রধান নয় গ্রহ অপেক্ষায় অনেক ছোট, অতএব কনিষ্ঠ গ্রহ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে।

গ্রহগণ যেমন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ কতকগুলি উপগ্রহ আছে, তাহারা কোন কোন গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরি-ভ্রমণ করে। চন্দ্র পৃথিবী গ্রহ প্রদক্ষিণ করে, অতএব উহা এক উপগ্রহ। পৃথিবীর যেমন এই এক উপগ্রহ, বৃহস্পতির ঐরূপ চারি, শনির আট, হর্শেলের ছয়, এবং নেপ্‌চ্যুন গ্রহের দুই উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহ এখান হইতে অতি ছোট দেখায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক অতি বৃহৎ পদার্থ। পৃথিবী কিরূপ বৃহৎ তাহা চারুপাঠের প্রথমভাগে লিখিত হইয়াছে। হর্শেল গ্রহ তাহার ৮২ গুণ, নেপ্‌চ্যুন ১০৮ গুণ, শনি ৭০৫ গুণ এবং বৃহস্পতি ১৪১৪ গুণ। কিন্তু সৌর জগতে গ্রহ উপগ্রহাদি যত বৃহৎ বস্তু আছে, সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর। উহা এত বৃহৎ, যে আমাদের অধিষ্ঠান ভূতা অবনীর তুল্য ১৪,০০,০০০ চতুর্দ্দশ লক্ষ জীব-

থেকে উহার গর্ভমধ্যে নিবিষ্ট থাকিতে পারে। উহার আয়তন একত্রীকৃত সমুদায় গ্রহের আয়তন অপেক্ষা প্রায় ৬০০ গুণ। যদি সূর্য্য মণ্ডলের অভ্যন্তর খনন করিয়া শূন্য করা যায়, এবং ভূমণ্ডল তাঁহার মধ্যস্থানে স্থাপন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এত স্থান থাকে, যে চন্দ্রমণ্ডল ভূমণ্ডলের কেন্দ্র হইতে এক্ষণে যত অন্তরে অবস্থিত আছে, তাহা অপেক্ষা আর ৮১,০০০ ক্রোশ অধিক অন্তরে স্থাপিত হইলেও, অনায়াসে পরিধি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে।

কোন গ্রহ সূর্য্যের নিকট হইতে কত অন্তরে অবস্থিত আছে তাহা জ্যোতির্বিদেরা গণনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বুধ প্রায় ১,৬৬,০০,০০০ এক কোটি ছিষট্টি লক্ষ ক্রোশ, শুক্র প্রায় ৩,০৯,০০,০০০ [illegible] কোটি নব লক্ষ ক্রোশ, পৃথিবী প্রায় ৪,২৮,০০,০০০ চারি কোটি অষ্টাবিংশ লক্ষ ক্রোশ, মঙ্গল প্রায় ৬,৩৩,০০,০০০ ছয় কোটি ত্রয়স্ত্রিংশৎ লক্ষ ক্রোশ, বৃহস্পতি প্রায় ২১,৫৬,০০,০০০ একবিংশতি কোটি ষট্পঞ্চাশৎ লক্ষ ক্রোশ, শনি প্রায় ৩৯,৬০,০০,০০০ ঊনচত্বারিংশৎ কোটি ষষ্টি লক্ষ ক্রোশ, হর্শেল প্রায় ৮০,২১,০০,০০০ অশীতি কোটি একবিংশতি লক্ষ ক্রোশ, এবং নেপচুন প্রায় ১,২৫,০০,০০,০০০ এক বৃন্দ পঞ্চবিংশতি কোটি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত রহিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সমস্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের পরস্পর দূরবর্ত্তিতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা সূর্য্যের নিকট হইতে এত দূরে রহিয়াছি, যে যদি কোন কামানের

গোলা প্রতি ঘণ্টায় ২২০ দুই শত বিংশতি ক্রোশ করিয়া গমন করে, তথাচ ২১ একবিংশতি বৎসরেও সূর্য্য-মণ্ডল স্পর্শ করিতে পারিবে না, এবং ডাকের গাড়ি যত দ্রুত চলুক না কেন ১,১০০ বার শত বৎসরের ন্যূনে তথায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবে না।

আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শারীরিক স্বাস্থ্য-সাধন।

পরমেশ্বর পরমেশ্বর অন্যান্য অশেষ প্রকার সুখকর ব্যাপারের ন্যায় শারীরিক স্বাস্থ্য-লাভও আমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন তিনি মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট দেহ প্রদান করিয়া কতকগুলি এপ্রকার মনোহর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, যে তাহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা হয়। আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন করা যেমন প্রথম কার্য্য, আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা সেইরূপ দ্বিতীয় কার্য্য।

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষায় সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগারস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন

গগন-মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে, পূর্ণ চন্দ্রের সুধাংশুর কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ, প্রভূত মান সম্ভ্রম, কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, সকল বিষয়েই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের [illegible]তেই চিত্ত আকুল [illegible] কষ্টেই তাহার দিন যাপন হয়। তাহার দুঃখের দিন অতি দীর্ঘই বোধ হয়। চির রোগী ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হইয়া উঠে। তাঁহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত চিত্ত। আহার-বিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া কোন ক্রমে কষ্ট সৃষ্টে কাল হরণ করা তাঁহাদের নিত্যব্রত হইয়া উঠে। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যত্ন না করা যে কুকর্ম্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন যে, শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট থাকে, এবং অন্তঃকরণ সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক স্বচ্ছন্দতাও [illegible] সুলভ হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী, এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে, শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধ-রিপু প্রবল হয়, এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হয়। যে শিশু সতত সাহ্লাদবদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও

রুদ্ধ হয়। তখন আর তাহার মনোহর মধুর বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং অর্দ্ধ স্ফুট সুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না। প্রখর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বলহীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে, এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে শরীর ও মন উভয়েরই গ্লানি উপস্থিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে, অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্ব-কার্য্যের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-রসের উদ্রেক হইতে থাকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মারকতা শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগ-শান্তি ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণাশক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এ প্রকার নৈকট্য সম্বন্ধ নিরূপিত রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবনরক্ষা, ধর্ম্ম-রক্ষা, সুখ-সাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্য-লাভার্থে যত্নবান থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীত-মনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা বিধেয় হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুস্থরূপে [illegible] রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই ; কারণ

শরীর ভগ্ন হইলে, ঐ সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণা দিয়া অথবা শিক্ষায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয়, এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্রকন্যাদিগকে যথানিয়মে প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম্ম হয়, তবে সাধ্য সত্ত্বে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই অধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্ম হত্যা যে মহাপাপ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জল প্রবেশ, অগ্নি প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা, আর জ্ঞানগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব এই মাত্র বিশেষ। অতএব, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীর রক্ষার্থে যে সমস্ত উত্তম নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় আছে।

শিশুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য।

শিশু সকলে স্বকীয় শুভাশুভ কিছুই জানিতে পারে না, অতএব তাহাদিগকে অনন্যভাবে জনক জননীর বশবর্ত্তী থাকিয়া তদীয় আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে হয়। তাঁহারা শিশুসন্তানদিগকে যাহা কিছু অনুমতি করেন, সমুদায়ই তাহাদের শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত। তাঁহারা তাহাদের সুখে সুখী ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী, তাঁহারা তাহাদের যত কল্যাণ চিন্তা করেন, ভূমণ্ডলে অন্য ব্যক্তি তাহার শতাংশের এক অংশও করে না। এই পরম শুভ সাধক তত্ত্ব শিশুগণের

যত হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল ততই তাহার পিতা মাতার আজ্ঞা পরিপালন করা সুখের বিষয় বোধ করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অনেকানেক বালককে ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার অবাধ্য হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, মাতা পিতার অনুকম্পা, অভিজ্ঞতা ও স্নেহ প্রবৃত্তির অল্পতা ইহার এক প্রধান কারণ। তাহারা পিতা বা মাতা বলিয়া জানিলেই যে তাঁহার বশীভূত হয় এমত নহে। জনক জননীর প্রবল বুদ্ধি, প্রচুর জ্ঞান ও সন্তানের শুভোন্নতি সাধনার্থ অশ্রান্ত যত্ন না দেখিলে, তাহার ভক্তিশ্রদ্ধা উদয় হয় না। পীড়িত ব্যক্তিকে বিস্বাদ বস্তু সুস্বাদ বোধ করিতে আদেশ করিলে, সে যেমন তাহা কোন মতেই সুস্বাদ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্যক্তির সতেজ বুদ্ধি বৃত্তি ও প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য না দেখা যায়, তাহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার সঞ্চার হয় না। শিশুগণের সমক্ষে সদ্গুণ ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগকে কেবল তিরস্কার করিলে, বরং বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি হয়। যাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার ও কর্কশ কথা প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদয় হওয়া দূরে থাকুক, প্রতিহিংসা, প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিই উত্তেজিত হইয়া উঠে। বিষাক্ত শর বিদ্ধ করিয়া কি কাহারও শরীর সুস্থ করা যায়? না ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে প্রদীপ্ত অনল শীতল হয়? নিম্ব-বৃক্ষ রোপণ করিয়া রসপূরিত অমৃত ফল লাভের প্রত্যাশা করা আর তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান দ্বারা বালকগণের

করে। পাপরূপ পীড়ায় পীড়িত বালকদিগকে এক স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে লোভের সামগ্রী ও অন্য অন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয় উপস্থিত না থাকে, সেই স্থানে তাহাদিগকে স্থাপিত করা উচিত। তাহাদিগের ব্যবহারের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবার ও তাঁহাদের উপর সর্ব্বদা অধ্যক্ষতা করিবার নিমিত্ত এক এক জন শিক্ষক নিযুক্ত রাখা আবশ্যক। তাহাদের যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দুর্ব্বল তাহা সবল করিবার নিমিত্ত নানামত উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে সেই সকল বৃত্তি স্ব স্ব বিষয় পাইয়া পরিচালিত হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্র শোধনার্থ এপ্রকার উপায় করা অনেকের পক্ষে সুসাধ্য নহে, অতএব এই বহুকল্যাণকর বিষয় সম্পাদনার্থে সাধারণ বিদ্যালয়ের ন্যায় এক এক সাধারণ স্থান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অধম বালকেরা তথায় অবস্থিতি করিয়া বিনীত ও শিক্ষিত হইলে, কালক্রমে শুদ্ধচরিত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ উপায় দ্বারাও যাহারা ন্যায়ানুগত ও ধর্ম্মপথাবলম্বী না হয়, তাহাদের পরিত্রাণ প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই।

মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়।

মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের

বিষয় [illegible] নিরূপণ করা গিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার অনু[illegible]ণের ফল অন্বেষণ করা যাইতেছে।

[illegible] ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, যে শরীর ও মন চালনা না করিলে [illegible] হয় না। "শরীর ও মনোবৃত্তি সকল চালনা [illegible] আর দ্বিতীয় পথ নাই" এই শুভকারী নীতি [illegible] আজ্ঞাস্বরূপ। যাহারা সুখস্বচ্ছন্দে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আমাদের জীবিত থাকাই বৃথা হইত; মনুষ্যের জীবনে ও পশ্বাদির জীবনে কিছুই বিশেষ থাকিত না। ফলতঃ [illegible] নিশ্চেষ্ট থাকা আমাদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। যদি কোন বালক গৃহ মধ্যে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, আর তথা হইতে তাহার ক্রীড়াসক্ত বয়স্যদিগের কোলাহল শ্রবণ করে, এবং তাহারা কি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাও অনুভব করিতে পারে, তবে সে বহির্গমন করিয়া তাহাদের সঙ্গী হইবার নিমিত্ত কেমন ব্যগ্র হয়? যদি তাহার পিতা তাহাকে নিবারিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাহার মনোদুঃখের আর সীমা থাকে না। এইরূপ, যদি কোন প্রবীণ ব্যক্তি ঘোরতর দুর্দ্দিনপ্রযুক্ত ক্রমাগত ৫।৬ দিন গৃহের বহির্গমন হইতে না পারেন, তবে তিনিও বিরক্ত ও অস্থির হন তাহার সন্দেহ নাই। যিনি সর্ব্বদা প্রসন্ন-চিত্ত থাকেন, এমত স্থলে তাঁহারও অপ্রসন্ন বদন দেখা যায়। অতএব মনুষ্যের সুখ-লাভ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে কি না, তাহা যৎকালে তিনি সর্ব্বথা নিশ্চেষ্ট থাকেন, তখনই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমরা শরীর ও মন পরিচালনে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিব, এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর সমস্ত জগতের সহিত মানব প্রকৃতির তদুপযোগী সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ, আহার ব্যতিরেকে শরীর রক্ষা পায় না, সুতরাং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অন্ন আহরণ করিতে হয়। পশুদিগের যেমন গাত্রলোম আছে, আমাদিগের শীতনিবারণার্থ তাদৃশ কোন স্বাভাবিক আচ্ছাদন নাই, সুতরাং শরীর ও মনের চেষ্টা দ্বারা পরিধেয় প্রস্তুত করিতে হয়। আমাদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে নিয়ত ব্যগ্র, কিন্তু চালনা ব্যতিরেকে তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। অতএব, আমাদিগের শরীর ও মনকে সম্যক্ সচেষ্ট রাখা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যত চালনা করিবে, ততই শরীরের অঙ্গ সকল সবল হইবে, মনের বৃত্তি সকল সতেজ হইবে, এবং অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হইতে থাকিবেক।

আমাদিগের জ্ঞানাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল। জ্ঞানলাভই সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, এবং কেবল জ্ঞানামৃতপান দ্বারাই তাহারা চরিতার্থ হয়। কোন অভিনব বস্তু সন্দর্শন মাত্রেই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, তাহার সবিশেষ গুণাগুণ জানিতে ইচ্ছা ও উৎসাহ হয় এবং তাহার স্বভাব ও প্রয়োজন যত জানা যায়, ততই সুখোদয় হইতে থাকে। সে বস্তু দ্বারা আমাদিগের কোন সাংসারিক উপকার না হউক, তথাপি তাহার আলোচনামাত্রেই এরূপ নির্ম্মল আনন্দ অনু-

ভূত হয় যে তজ্জন্য শারীরিক ও সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইলেও সে রমণীয় আলোচনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। অতএব, ইচ্ছা করিলেও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভাবিত নহে। অতএব, মনোবৃত্তির চালনাতেই যে সুখানুভব হয়, ও তৎসমুদায় চালনা করা যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

যদি আমরা জন্ম-কালেই বুদ্ধিবৃত্তি-নিষ্পাদ্য সমুদায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতাম, এবং আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব বিষয়ভোগে এককালেই চরিতার্থ হইয়া থাকিত, ও তাহাদিগকে আর চালনা করিবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে এইক্ষণকার অপেক্ষা সুখের অল্পতা ভিন্ন কখনই আধিক্য হইতনা। যদি একবার মাত্র ভোজন করিলেই চিরকাল উদর পরিপূর্ণ থাকিত, ও ক্ষুধার উদ্রেক আর না হইত, তবে প্রত্যহ ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিয়া যেরূপ সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে এককালে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ধনলাভ হইলেই ধনলোভী ব্যক্তির আহ্লাদ হয়, কিন্তু সে আহ্লাদ অতি অল্পকাল-স্থায়ী। হস্ত-গত ধনে তাহার তৃপ্তি হয় না; সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ অধিক উপার্জ্জনার্থে ব্যগ্র হয়। যদিও লোকে তাহাকে অর্ব্বাচীন বোধ করে, কিন্তু সে ব্যক্তি স্বীয় স্বভাবেরই বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তাহার অর্জ্জন-স্পৃহা বৃত্তির চালনাতেই সুখানুভব হয়, এবং কেবল ধনান্বেষণ ও ধনোপার্জ্জনদ্বারা সে বৃত্তি সব্যাপার থাকিতে পারে। অতএব যদি ঐ বৃত্তি একবারে অপর্য্যাপ্ত বিষয়

লাভ করিয়া চিরকাল অনুদ্যম ও ব্যাপারশূন্য থাকিত, তাহা হইলে মানববর্গ তদুৎপন্ন সুখভোগে কখনই অধিকারী হইত না। এইরূপ হইলে আর মনোবৃত্তিও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে এক্ষণে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিয়া যে প্রচুর সুখ সম্ভোগ করা যাইতেছে তাহা আর আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিত না। এরূপ হইলে এককালে আমাদের মনশ্চেষ্টার অন্ত হইত, আমাদিগের প্রথম চেষ্টাই শেষ হইত, অত্যল্প কালেই সর্ব্ব বস্তু পুরাতন বোধ হইত। কিছুতে আর কৌতূহল জন্মিত না, কিছুতেই উৎসাহ হইত না এবং কোন বিষয়ে আশাবৃত্তি সঞ্চরণ করিত না; এমন যে পরম রমণীয় বিচিত্র সংসার তাহাও নিতান্ত নীরস বোধ হইত। অতএব, পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তাহার উপর আর কথা নাই। যেরূপ মনোবৃত্তি সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহাদিগকে তদুপযুক্ত বিষয় সমুদায়ও প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োজন জানিয়া যথোচিত ব্যবহার করিলেই ইষ্টলাভ ও আনন্দসঞ্চার হয়, আর এতদ্বিরুদ্ধাচরণ করিলে অনিষ্ট-ঘটনা ও দুঃখোৎপত্তি হয়। পরমমঙ্গলালয় পরমেশ্বর, তাহাদের গুণাগুণ অনুসন্ধান করিবার ভার আমাদের উপর সমর্পণ করিয়া আমাদের মনোবৃত্তি সকলকে সদা সব্যাপার রাখিবার কি সুন্দর কৌশল করিয়াছেন।

লোকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন। মহার্ণবপরিবৃত স্থলভাগ, সমুদ্র-স্থিত দ্বীপ-পুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্-বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদধারিণী পর্ব্বত শ্রেণী, কন্দর ও তুঙ্গদেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, তুষারশৈল, তুষারদ্বীপ, গন্ধকদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনা-পথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গদেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত ভূগর্ভ বিনির্গত গভীর গর্জন শ্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিখর-দেশ হইতে অগ্নিময়ী নদী স্বরূপ ধাতু-নিস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানস-পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক হিমগিরিশিখরে উত্থিত হইয়া নত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণ তলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত স্ফুরিত হইতেছে, এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া অরণ্য সমুদায় উৎপাটন করিতেছে ও সমুদ্র-সলিলে করালতম কল্লোল-কোলাহল উৎপাদন করিয়া ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজার সংহার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষম বর্ণন করেন, এবং কত

বেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণ বিস্মিত করিতে পারেন। তিনি বাসনা-রথে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিচূড়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ দিগে উত্থিত হইয়া চন্দ্র-চতুষ্টয়-পরিবৃত বৃহস্পতি, হৃদয়হর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল অঙ্গুরীয়-ত্রয় পরিবেষ্টিত শনৈশ্চর, ষষ্ট চন্দ্র সহকৃত হর্শেল গ্রহ, এবং চন্দ্রদ্বয় সম্বলিত নেপচ্যুন নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি নক্ষত্রলোক অবলোকন করত, অশৃঙ্খলবদ্ধ ও অক্লিষ্টপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, অসীম আকাশমণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন। গগনমণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ সহকারে মানবজাতির নেত্রগোচর হইয়াছে, তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সংখ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীব-লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপার মহিমার্ণব মহেশ্বরের অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া ভক্তি-রসাভিষিক্ত পুলকিত হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে পারেন।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।

আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমন।

আর্য্যেরা কি শুভদিনে ও কি শুভক্ষণেই সিন্ধু নদের পূর্ব্ব পারে পদার্পণ করিয়াছিলেন; ভারতবর্ষীয়েরা উত্তর কালে

শৌর্য্য, বীর্য্য, ও পরাক্রম প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিম-নিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরি-গুহায় আশ্রয় লইয়াছে, এবং সে দিনেও সে শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ গুরু-গোবিন্দ শিখ-জাতির হৃদয় ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাঁহারা এই আর্য্য ভূমিতে অবতারিত হন! মহারণ-পরাক্রান্ত দীর্ঘকায় পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হলযন্ত্র ও অপর হস্তে রণ-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া, উৎসাহিত ও আশঙ্কিত মনে, স্নেহ পালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষ প্রবেশ করিতেছেন ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়। ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আম্র শাখা সম্বলিত সলিল পূর্ণ কলসা-বলী সংস্থাপন করিয়া রাখি, এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি, ও সেই পূজ্য-পাদ পিতৃ পুরুষদিগের পদাম্বুজ-রজঃ গ্রহণ করিয়া মস্তক পবিত্র করিতে থাকি।—আহা! আমি কি অসম্বদ্ধ অলীকবৎ প্রলাপ-বাক্য বলিতেছি! তখন আমাদের অস্তিত্ব কোথায়! আমরা তখন অনাগত কাল-গর্ভে নিহিত ছিলাম!—এই সমস্ত স্বপ্ন কল্পিত বাসনায় এই স্থলেই অবসান হওয়া ভাল! পাঠকগণ! এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করু।

সর্ব্বাপেক্ষায় তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিতেন। তাঁহারা তখন ঐ সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বভাব ও গুণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। স্বাকার সম্বন্ধে কেবল আপনাদের অর্থাৎ মানবজাতির প্রকৃতিই বুঝিতেন এবং তদৃষ্টে ঐ সমস্ত জড়ময় বস্তুতেও মনুষ্যাদির ন্যায় হস্ত পদাদি অবয়ব এবং ক্ষুৎপিপাসা ও কামক্রোধাদি মনোবৃত্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মনুষ্যেরা কোন্ আদিম কালাবধি আপনাদের উপাস্য দেবতাকে ঐরূপ মানব ধর্ম্মাক্রান্ত জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন, অদ্যাবধি ঐরূপ করিতেছেন এবং হয়ত চিরকালই ঐরূপ করিতে থাকিবেন। যে সমস্ত জ্ঞানাভিমানী ইদানীন্তন ব্যক্তিরা এখনও অপরিজ্ঞাত বিশ্বকারণের কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আর স্বীকার করেন না, তাঁহারাও মানব-মনের স্নেহ, মায়া, ক্ষমা, প্রণয়াদি কতকগুলি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনন্তগুণিত করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে সমারোপণ করেন। এইরূপ মানবত্ব-সমারোপণ রীতি তাঁহাদের এমন অস্থিগত হইয়া গিয়াছে যে, বিচার-ধারে বিখণ্ডিত হইয়া গেলেও তাঁহারা উহার বিমোহিনী মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। প্রাচীন আর্য্যেরা এই রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া বিশ্বাস করিতেন, নিশ্চিতপূর্ব্ব দেবতাগণ নরজাতির ন্যায় ইচ্ছানুগত হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করেন, ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া অন্ন জল গ্রহণ করেন, ক্রোধ হিংসার পরবশ হইয়া শত্রুদল সংহার করেন, প্রবৃত্তি-বিশেষের বশীভূত হইয়া দার পরিগ্রহ পুরঃসর গৃহ ধর্ম্ম পরিপালন করেন, এবং এই

বিশ্বব্যাপার অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী থাকিলেও, তাঁহারা দয়া দাক্ষিণ্যের অনুসারী হইয়া ভক্তজনের মনোরথ পূর্ণ করেন।

বিদ্যাবিষয়ক স্বপ্নদর্শন।

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া আমি কিয়ৎকালাবধি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং নানা স্থান পর্যটন করিয়া এক্ষণে মথুরা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক সুললিত লহরীলীলা অবলোকন করিতেছিলাম; এবং তথাকার সুস্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। এক শত দীপ্যমান হীরকখণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিবালোকন্যায় শোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষাস্বরূপপ্রায় করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিলতরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগনাবস্থিত মেঘবিম্বদ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতরশ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, পশুপক্ষিসকল নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিলেন।

তিনি আপনার কপোলপ্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বাক্য স্ফূরণ না হইতে হইতেই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় সুশীলতা ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন "আমি তোমার মানস জানিয়াছি, আমার নাম বিদ্যা, তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিতেছিলে, তাহার এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই রম্য কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি; চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার এই আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া হৃষ্ট-মনে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয় পার্শ্ববর্ত্তি বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে অরণ্যের শৈত্য, শোভা, ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হে দেবি, এস্থানের নাম কি, এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে?" তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া উত্তর করিলেন "এ বিদ্যারণ্য, এ অরণ্যে অতি সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন; কিন্তু ইহার ফল ভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শন-মাত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল আহরণের প্রত্যাশায় কতকদূর বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্ব্বার

চিহ্ন নাই। আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য পরম কৌতূহলী হইয়া বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, "এই সারবান অক্ষয় বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তী জ্যোতিষ বৃক্ষের মূল ইহাতে সম্বদ্ধ দেখিতেছ; প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তদুপরি স্থাপিত আছে।" বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে; শাখা প্রশাখা ও বৃক্ষকুঞ্জ সম্বলিত এক গণিত বৃক্ষ অর্দ্ধ কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ-প্রদর্শিকা বনদেবী সাশ্রুবচনে কহিলেন "সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষ লতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কএকটা কলম তোমারদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্নজাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া উৎসাহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে! আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়, কারণ যতগুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই একজাতীয়, তাহার নাম স্মৃতি; আর বামদিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।" আমি এই দুই জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। দেখিলাম, দক্ষিণদিকের সমুদায় বৃক্ষ অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি

শুষ্ক ও ভগ্নপ্রায় হইয়াছে, কিছুই পারিপাট্য নাই, বোধ হইল যেন এক প্রবল ঝঞ্ঝাবাত বায়ু সমুদায় বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বামদিগের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধ মাত্র আছে, কোনটার বা সমুদায় গিয়া একদিকের একমাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম; কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা সহকারে মহাকোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।”

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরুসমূহ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যা দেবীকে কহিলাম, “দেবি! আজি তোমার প্রসাদে অতি অনুপম সুখ লাভ করিলাম। ভূমণ্ডলে এমত নির্ম্মল সুখধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয় এস্থানে অতি শান্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।” এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিষণ্ণ বদনে কহিলেন ‘তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, এস্থান ধর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে, এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ, পুণ্যাত্মা আচার্য সকলই এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে, পামর পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

ঐ দেখ, সিকান্দীয়বেশধারী অভিমান মস্তক উন্নত ও গ্রীবা দেশ বক্র করিয়া অত্যন্ত উগ্র ভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে, ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভিব্যাবহারে লইয়া মহা শ্লাঘা প্রকাশ পূর্ব্বক সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না, যে উহারা মনে মনে বিশ্বসংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে? তৎপার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজকান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উনি অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কোন ব্যক্তি অভিমানের গাত্রমাত্র স্পর্শ করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার বৈরনির্য্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এ দিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেক। এক্ষণে, ও যে প্রকার স্থূল কায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে বিশ্ব সংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি জান? লোভ। বিশেষতঃ কাননতকতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচারে এস্থানের অতিশয় অপযশ ঘোষণা হইয়াছে। উহাদের নাম কাম ও পানদোষ। এককালে এই অপূর্ব্ব আনন্দকাননে নিষ্কলঙ্ক দাম্পত্যপ্রেমেরও প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, কোন দুষ্ক্রিয়া এস্থানে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইত না। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দাম্পত্য প্রেম ও তাঁহার সহচরদিগের দৈন্যদশা উপস্থিত হইয়া পরানুরাগী কামরূপী পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইতেছে। অবলোকন কর,

পাপদোষ আপনার দলবল সহকারে কি অদ্ভুত আচরণ করিতেছে? কি বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে! দেখ দেখ, তাহার ভয়ে ধর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে আর কতকগুলি দুর্বুদ্ধি পিশাচ পিশাচী আসিয়া তাহার সহিত অট্ট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। কি বিস্ময়! এমন পরিশুদ্ধ পুণ্যধামের এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা এই সমস্ত পাপের নিকটে আশ্রয় দেয় তাহারা তদ্দ্বারা আপনাকেই প্রহার করে। আমি এ অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া স্বয়ং এরূপ ভূরি ভূরি অনিষ্ট ব্যাপার আর কত দেখাইব? ঐ ঘন পল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরমসুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ উহার পর কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার অন্তরে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত, ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল কতকগুলি বেশ ভূষা কল্পনা দ্বারা তৎসমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে: উহার নাম কপটতা।"

সমুদায় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম, এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোক দুঃখেতেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই একটি সুখধাম ছিল, তাহাতেও এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে! যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্ব দুঃখনিবারিণী সন্তাপনাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া

দেখিলাম, যে সকল রাক্ষস পিশাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বিশেষতঃ কাম ও পানদোষ এই দুই জন নানাবিধ সুমধুর প্রলোচন বাক্য বলিয়া আমাকে তৎপথ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহাদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম তখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয় এই আশঙ্কায় পরম হিতৈষিণী বিদ্যাদেবীর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা দুই জনে ইহাঁর দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহাঁর নিকটস্থ হইতে না পারে।"

এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্ন বদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার বাঞ্ছিত স্থান, ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম পুলকিত চিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল প্রত্যাশায় মহোৎসাহ সহকারে দ্রুতবেগে পাদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিলম্বে পর্ব্বতসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক

দৃঢ়ব্রতা সুশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহুপরিশ্রমী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছে; তাঁহারা যাত্রিদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা পুরুষের নাম যত্ন।

এ পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। আকস্মাৎ কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম সম্প্রতি এই স্থানেই অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী অন্তর্য্যামিনী শক্তি দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন "হে প্রিয়তম! এ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান, সাবধান।" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে যত আরোহণ করিতে লাগিলাম ততই ক্লেশের লাঘব এবং সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভব হইল! তথাকার সুশীতল মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসম্বাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল, এবং বোধ হইল বিশ্ব সংসারে এমন রম্যস্থল আর দ্বিতীয় নাই। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর

দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম, এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। পরে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টি করিলাম, কতকগুলি পরম পবিত্র সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যা সরোবরতটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী, এবং সারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া অতুল প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে; এরূপ বোধ হইল, যেন আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া গমনাগমন করিতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইহাঁরা দেবকন্যা হইবেন তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যা দেবী সাতিশয় অনুকম্পা পুরঃসর সহাস্য বদনে কহিলেন, "তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, ইহাঁরা দেবকন্যাই বটেন, এবং এই ধর্ম্মাচল ইহাঁদের বাসভূমি, ইহাঁদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহার নাম মৈত্রী ইত্যাদি সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইহাঁদের রূপ গুণ ভুবন-বিখ্যাত আছে; ইহাঁরা যে পর্য্যন্ত সুশীল তাহা কি বলিব। বিদ্যারণ্যযাত্রিদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহারদিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তোমার চরম লক্ষিত স্থান সমাধিকুঞ্জ প্রাপ্তির এখনও বিলম্ব আছে অতএব এই সরোবরে স্নান করিয়া লও।"

[illegible] বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে আমি শান্তিবাপীতে অবগাহন করিয়া যেরূপ স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইলাম, তাহা বচনাতীত; দেবকন্যাগণও আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিশুদ্ধ অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। আহা! তাঁহাদের কি বাৎসল্য! কি অমায়িক ভাব! [illegible] আমাকে সমভিব্যাহারে করিয়া [illegible] কুঞ্জ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। এপথ অত্যন্ত বিরল কারণ এ পবিত্র তীর্থের যাত্রী প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বে ঐ স্থান অতি দূরবর্ত্তী বোধ ছিল, ভক্তিপ্রসাদাৎ নিমেষমাত্রে নিকট হইয়া আসিল। তৎসন্নিধানে উপ[illegible] হইয়া অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার অদৃষ্ট দর্শন করিলাম। এমন নির্জ্জন নিস্তব্ধ, নিবিড়, কুঞ্জ, এমন প্রেম-পূর্ণ আনন্দধাম আর কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই। সেখানে কি অদ্ভুত, কি আশ্চর্য্য [illegible] অনির্ব্বচনীয় দর্শন! [illegible] নানাদেশীয় পবিত্র চরিত্র বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা [illegible] অতি নির্ম্মল স্থির সুখ সম্ভোগপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। [illegible] এখন যেন আমাকে তথায় দর্শন করিয়া তাঁহাদের দ্বিগুণ আনন্দ হইল! তাঁহাদিগের জ্যোতিঃপূর্ণ আনন্দোৎফুল্ল মুখশ্রী অবলোকন কারণে সুধার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। পরে আমি কুঞ্জের [illegible] অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম, ততই আনন্দ প্রবাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে [illegible] কি [illegible] অনুপম সুখধাম তাহা বর্ণনা করা যায় না। সে [illegible] লেশ নাই। “রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, ক্রমাগত উৎসারিত হইতেছে।” আমি এরূপ পরমাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই [illegible]-মারুত-[illegible] যমুনা-কূলেই শায়িত রহিয়াছি।

পুরাবৃত্তসার।

যুদ্ধ-প্রণালী।

অতি পূর্ব্বকালাবধি মনুষ্যগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যত প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা যায় ততই তাৎকালিক লোকদিগের বিগ্রহানুরাগ অধিক ছিল, বোধ হইতে থাকে। বন্যদশায় জীবিকোপার্জ্জন করাই কঠিন। সুতরাং আপনার প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য অন্যের নিকট থাকিলে বর্ব্বর ব্যক্তি যে অধিকারীকে বিনাশ করিয়া সেই দ্রব্য লইবার চেষ্টা করিবে, ইহা সকলেই বোধ হইতে পারে। অধিকন্তু, সে সময়ে শাসনের পারিপাট্য ছিল না; দেশও বিস্তীর্ণ ছিল না; সুতরাং জনে জনে, কুলে কুলে, সমাজে সমাজে, অনুক্ষণ এইরূপে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। আবার যদি একবার কোন কারণে দুই পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইল তবে সেই বৈরিতা পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক হইয়া চলিত। প্রায়ই এক পক্ষের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ না হইলে উহার ক্ষান্তি ছিল না। যখন রাজশাসন উত্তম না থাকে, তখন বৈরনির্যাতন একটী পরম ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়।

বোধ হয়, জনগণ প্রথমে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ দ্বারাই পশুবধ এবং পরস্পর যুদ্ধ করিত, তখন অন্য অস্ত্রশস্ত্রাদির ব্যবহার ছিল না। ক্রমে লগুড়, কাষ্ঠময় বা শিলাময় দণ্ড,

ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। তৎকালেই কঠিন পশুচর্ম্ম দ্বারা শরীর আবৃত করাও আরম্ভ হইয়া থাকে।

ক্রমে মনুষ্য সমাজের যেমন উন্নতি হইতে থাকে যুদ্ধের উপকরণ সকলও তেমনি দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে। ভূম্যধিকার সম্পন্ন ধনশালী জনগণ বর্ম্মাদি শরীরত্রাণ প্রস্তুত করাইতে এবং যানবাহনাদি রাখিতে পারেন। সামান্য দুঃখিত লোক সকল তাদৃশ অর্থ ব্যয়ে সমর্থ হয় না। সুতরাং সেই সময় হইতে একটী ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। ভূম্যধিকারিগণ আর কোন কর্ম্মই করেন না। যাহাতে শরীরের বল বাড়ে, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে, অশ্ব হস্তি রথাদি চালনে পটুতা হয় এই সকল শিক্ষাই তাঁহাদিগের বাল্যাবস্থার এক মাত্র উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ রণদক্ষ-ব্যক্তিরা যে এক এক জনে নিরস্ত্র, অশিক্ষিত, দুর্ব্বল শত শত সৈনিকের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বোধ হয়, এই জন্যই সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন কবিতায় তাদৃশ যুদ্ধ-বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। সেই সকল কাব্যে সহস্র অত্যুক্তি স্বীকার করিলেও, ঐ সকল বিবরণ যে একেবারে অমূলক, এমত বোধ হয় না। তখন এক এক জন মহারথ যে বহু-সংখ্যক পদাতির নিপাত করিতে পারিত, একথা মিথ্যা নহে। যে সকল দেশ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় সেই সেই দেশেই রথের এবং গজের সমধিক ব্যবহার হইয়াছিল। যে সকল দেশ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর তথায় ভূম্যধিকারিবর্গ অশ্বশিক্ষায় নিপুণ হইয়াছিলেন। আসিয়ার ঐ প্রাচীন

দেশ মাত্রেই যুদ্ধের প্রথা এই পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। সেনাপতি, যুদ্ধকালে রথী, অশ্বারোহ এবং গজারূঢ় যোদ্ধৃ-বর্গের উপরই বিশেষ লক্ষ্য করিতেন—পদাতিগণের প্রতি অধিক আদর করিতেন না।

গ্রীক জাতীয়দিগের যুদ্ধ-প্রণালীও যে প্রথমত এইরূপ ছিল, তাহা হোমার বিরচিত মহাকাব্য দর্শনেই প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রীকেরা অতি শীঘ্রই প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী অবধারিত করিলেন। তাহা করাতে ভূম্যধিকারী বর্গের সম্মান লাঘব হইল। প্রজামাত্র ভূম্যধিকারী হইতে পারিল; সুতরাং তাহাদিগের নিতান্ত দরিদ্রাদশা না থাকাতে সকলেই যুদ্ধের সজ্জা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া রাখিতে পারিল। বিশেষতঃ গ্রীষদেশ অত্যন্ত পার্ব্বতীয়; তাহা অশ্বারোহ সৈন্যের বিশেষ বিক্রমের স্থল নহে। অতএব তথায় অশ্বারোহিগণ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত এবং পদাতিকেরা অধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিল। যে স্থানে পদাতি সৈন্যের সমাদর তথায় রাজ্যশাসন-প্রণালীও নিতান্ত জঘন্য হইতে পারে না।

রোমও স্বতন্ত্র-প্রজ দেশ ছিল। পদাতিক সৈন্যের সমধিক আদরও ছিল। গ্রীক এবং রোমীয় পদাতি সৈন্যের সম্মুখে তাৎকালিক কোন জাতীয় লোকেই সংগ্রাম করিতে পারে নাই। যে ঐ দুই জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই যেমন অনলে তুলা দগ্ধ হয় তদ্রূপ, অত্যল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যেও যুদ্ধ-প্রণালী অতি

কাল এইরূপ প্রথা আসিয়াছে, দেখা যায়। যখন উহাদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারী বর্গের প্রাধান্য ছিল, তখন পদাতি সৈন্যের যথোচিত আদর ছিল না। ক্রমে যেমন শাসন-প্রণালীর উৎকর্ষ হইতে লাগিল, অমনি পদাতিদিগেরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইল।

পদাতির সমধিক গৌরব হইলে সমর-প্রণালীর অন্যরূপ একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন রাজ্যের প্রথমাবস্থায় প্রজাগণ শান্তিকালে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, যুদ্ধ কাল উপস্থিত হইলে অস্ত্রধারী হইয়া রণস্থলে যায়। সেকালে ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব ভূম্যধিকার হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গিয়া রাজার সহায়তা করেন। কিন্তু রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূম্যধিকারিগণ খর্ব্ব গৌরব হইলে আর এই রূপ থাকে না। রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি বৃত্তিভুক্ সেনা নিযুক্ত হয়। তাহরা রাজকোষ হইতে যাবজ্জীবন বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কেবল যুদ্ধই একমাত্র অবলম্বন করিয়া থাকে। এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রথাব হইয়াছে।

এক্ষণে যুদ্ধ একটী প্রধান বিদ্যার মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়নাদি বিবিধ শাস্ত্র, শস্ত্র বিদ্যার সহকারী হইয়াছে। কোন অসভ্য জাতির এমত সামর্থ্য নাই যে, সভ্য ইউরোপীয়দিগকে পরাভূত করিতে পারে। কিন্তু যেমন বিদ্যা প্রযুক্ত এক্ষণে যুদ্ধের কৌশল বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ শান্তি গুণেরও প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যুদ্ধের অনেকানেক ভয়ঙ্কর দোষেরও পরিহার হইয়াছে। এক্ষণে সুসভ্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যাহারা

যুদ্ধ-বন্দিভাগণের প্রতি নিরর্থ অত্যাচার হয় না—শত্রু শরণাপন্ন হইলে তাহার প্রাণ নাশ করা হয় না—প্রজা মাত্রকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হয় না—ইউরোপীয় কোন রাজ্য প্রবল হইলে অমনি দিগ্বিজয় করিতে নির্গত হয় না—এবং কোন কোন সদাশয় ব্যক্তির যত্ন বলে এমত অভিলাষও হইতেছে যে, কোন রূপে যদি একেবারে যুদ্ধ প্রথা পরিত্যাগ করা যায় তাহা হইলেই ভাল হয়।

রোমের ইতিহাস।

জুলীয়স সীজার রোম সাম্রাজ্যের এক মাত্র কর্ত্তা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও আপনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহ্যে প্রাচীন প্রথা সমুদায় প্রচলিত রাখিয়া বাস্তবিক একাধিপত্য শক্তি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যশাসন অতি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। অতি উত্তম উত্তম গৃহ প্রাসাদ দ্বারা রোম নগর সুশোভিত হইল। অনেকানেক রাজবর্ত্ম ও জলপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়া বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রতাপে সমুদায় সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব এবং উপশান্ত হইয়া থাকিল। এই সময়ে কতিপয় ব্যক্তি পুনর্ব্বার প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তক করিবার জন্য সীজরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তন্মধ্যে ব্রুটস এবং কাসিয়স নামা দুই ব্যক্তি সমধিক প্রধান; ইহাঁরা জানিতেন যে

যে, রোমের স্বাধীনাবস্থার কাল গত হইয়া গিয়াছে। এখন পুরুষ কর্তৃ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে স্বাধীনতার শব মাত্র [illegible] ত হইতে পারে, তাহার জীবন স্বরূপ যে [illegible] [illegible] আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া আসিতে পারে না। [illegible] উঁহারা সীজরকে সেনেট গৃহ মধ্যে হত্যা করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে লোক সাধারণ প্রথমে স্তব্ধ ও সাতিশয় ভীত হইল পরে যখন সীজরের অধীন আণ্টনী নামা এক জন সেনাপতি সীজরের মৃত দেহ প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিলেন—যখন ঐ মৃত মহাত্মার গুণগ্রাম ও পরোপকারিতার নানাবিধ প্রমাণ দর্শাইলেন—তখন সকলেই হত্যাকারীদিগের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায় ব্রুটস্ এবং কাসিয়স রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। নানা বিবাদের পর সীজরের ভাগিনেয় অক্টোবিয়স এবং তাঁহার সেনাপতি আণ্টনী এবং গল দেশের শাসনকর্ত্তা লেপিডস্ এই তিন জনে মিলিত হইয়া সমুদায় রোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব বিভাগ করিয়া লইলেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এক দিবস রাজা জয়সিংহ স্বীয় শিবিরে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ মহারাষ্ট্রপতি একাকী এবং নিরস্ত্র তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজপুত-পতি তৎক্ষণাৎ তটস্থ হইয়া কিছুকাল ইতিকর্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বীর পুরুষেরা উপস্থিত [illegible]

লক্ষেরও গুণ গ্রহণে সক্ষম। জয়সিংহ শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার আপনার সৈন্যসংখ্যা অতিরিক্ত না হইলে তিনি স্বয়ং অকিঞ্চিতকর হইতেন। অতএব শিবজীর প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্র-পতিকে নিজ সমীপস্থ দেখিয়া প্রথমতঃ [illegible] ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু পরক্ষণেই বিশিষ্টসমাদর সহকারে ভ্রাতৃ সম্বোধন এবং আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক স্বপার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করাইলেন। মহারাষ্ট্র-পতি মৌনী হইয়া বসিলেন। রাজা জয়সিংহ ভাবে বুঝিতে পারিয়া পারিষদদিগকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা স্থানান্তর হইল। শিবজী কহিতে লাগিলেন।

“মহারাজ! আমাকে এমত সময়ে দেখিয়া আপনি অবশ্য বিস্মিত হইয়াছেন। হইবেনই ত। আমি যে দুরাশায় বশীভূত হইয়া আসিয়াছি তাহা স্মরণ করিলে আপনিই বিস্ময়াবিষ্ট হই। কিন্তু মহারাজ! মন যাহা বলে তাহা কখন নিতান্ত মিথ্যা হয় না। কিছুকাল হইল আমার অন্তঃকরণে কেমন সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে উভয়ের তাৎপর্য্য অবগত হইলেই এই দুরন্ত সমরাগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, এবং আমরা যেমন উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক জাতি এবং (বোধ করি আপনি জানেন) এক গোত্রোদ্ভব, তেমনই আশা করি, উভয়ে এক পরামর্শী এবং এক কর্ম্মা হইব। মহারাজ! আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। তাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং প্রজা

চেষ্টা করিলে ও সকল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। এখ-
নও আপনারা কতক ধন স্বদেশস্থ [illegible] তাঁহার মর্য্যাদার
রক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালসমূহের যদি উহাঁর
দুষ্টাত্মাধারী [illegible] মধ্যেই স্ব-
র্ণ মাণিক্যাদি প্রসব ভারতভূমি আর উৎকৃষ্ট দ্রব্য
প্রসবে সমর্থা হইবেন না! মহারাজ! আমার এই প্রার্থনা,
যেন এমন দিন কখন উপস্থিত না হয় যে, কোন ব্যক্তি
হিন্দুজাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন।
মহারাজ! যাহারা আপনারাই এই জাতিকে নিস্তেজ করিয়া
পরে ক্ষীণবীর্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধা-
রণ [illegible]! মহারাজ! অধুনা ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত
নিস্তব্ধাবস্থা দৃষ্ট হইতেছে সে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্ব্ব-
ল্যাধীন নিস্পন্দ হওয়ার ন্যায়,—তাহা স্বাস্থ্যের সুখানুভব
নহে।"

ইংলণ্ডের ইতিহাস।

ইউরোপের মানচিত্রের বায়ুকোণে যে একটী অপেক্ষা-
কৃত বৃহদাকার দ্বীপ দৃষ্ট হয় তাহারই এক ভাগের নাম
ইংলণ্ড। ঐ দ্বীপ ইংরাজদিগের নিবাসভূমি। দ্বীপমাত্রেরই
বায়ু প্রায় সমশীতোষ্ণ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেরও সেইরূপ।
এই দেশের ভূমি নিতান্ত অনুর্ব্বরা বোধ হয় না, কিন্তু
তাহাও এমত উর্ব্বরাও নয় যে, কৃষিজীবীদিগের [illegible]
পরিশ্রম ব্যতিরেকে বহুফলদায়িনী হয়। ইহার উপকূল

ভাগে অনেক সাগরশাখা প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাতে সুনাব্য নদীও অনেক আছে। সুতরাং এই দেশ বাণিজ্য-বৃত্তির পক্ষে [illegible] উপযোগী। এখানকার আকরিকের মধ্যে পাথুরে কয়লা, [illegible] লৌহ, এবং টিন প্রধান; আর উদ্ভি-দের মধ্যে [illegible] অতিশয় প্রসিদ্ধ; ইহার কাষ্ঠদ্বারা সুদৃ-ঢ় অর্ণবযান প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পুরাকালে ইংলণ্ড দেশে নিতান্ত অসভ্যস্বভাব, কৃষি ও বাণিজ্যবিমুখ, অর্ণবযান প্রস্তুত করণে অশক্ত, কিন্তু সাহসী, ধর্মপরায়ণ, এবং সংগ্রামাসক্ত কেল্ট জাতির বাস ছিল। বহুকাল এই দেশের কোন বৃত্তান্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ফিনিসীয় এবং কার্থেজীয় বণিকেরা কখন কখন এই দেশে বাণিজ্যার্থে আগমন করিত এবং এখানকার টিন, লৌহ, চর্ম, এবং [illegible] দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তদ্বিনিময়ে কাচ, পিত্তল ও নানাবিধ সামগ্রী প্রদান করিয়া যাইত। তাহার বহুকাল পরে যখন রোমকেরা আপনাদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার করে তখন তাহাদিগের সেনাপতি জগদ্বিখ্যাত জুলিয়স সীজর সমুদায় গল দেশ জয় করিয়া ৫৬ খৃঃ পূঃ অব্দে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আইসেন। তিনি কেণ্ট প্রদেশের উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে তদ্দেশ-বাসিগণ পদাতি, অশ্বারোহী এবং রথারূঢ় হইয়া নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু সীজরের রণপাণ্ডিত্যে এবং তাঁহার সৈন্য-গণের সুশিক্ষাগুণে ঐ আদিম নিবাসীদিগের সকল প্রযত্ন

নিশ্চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইত। এমন বন্যদশাপন্ন লোকের মধ্যে যে কিরূপ শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহা সুনিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় না। এই পর্য্যন্ত অবগতি আছে যে, ব্রিটনেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া এবং এক একটী জাতি এক এক জন শাসনকর্ত্তার অধীনে বাস করিত। ইহাদিগের ধর্ম্ম প্রণালীও অন্যান্য তাদৃশাবস্থ জাতির ধর্ম্মপ্রণালী হইতে অধিক ভিন্ন ছিল না। ইহাদিগের মধ্যে ড্রুইড্ নামে একটী যাজক সম্প্রদায় ছিল। তাহারা রাজাদিগের অপেক্ষাও সমধিক পরাক্রমশালী হইয়া যাহা মনে করিত তাহাই করিতে পারিত। ড্রুইডেরা পরকাল এবং পরজন্ম স্বীকার করিতেন। পরমেশ্বর এক এবং তাঁহার অধীনে অসংখ্য দেবদেবী আছেন ইহাও মানিতেন। কখন কখন যুদ্ধধৃত হতভাগা বন্দিগণকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ঐ দেবতাগণের উপাসনা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই নিবিড় অরণ্য মধ্যে কেবল জপ তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরারাধনার নিমগ্নচিত্ত হইয়া থাকিতেন। ড্রুইড্দিগের শক্তি অদ্বিতীয় ছিল। ইঁহারা যদি কোন রাজাকেও অভিশপ্ত করিতেন তবে আর কেহই তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিত না, কেহই তাঁহার কোন সাহায্য করিত না। যাহার ইচ্ছা সেই তাঁহার প্রাণবধ করিতে পারিত, এবং বহুস্থলে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি অন্নজল অভাবেই প্রাণ-পরিত্যাগ করিত। ফলতঃ ব্রিটনেরা সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের যাজকবর্গেরই অধীন হইয়াছিল। কিন্তু যখন রোমকেরা, প্রবল হইয়া সম্রাট ক্লাডিয়স্ এবং নিরোর

আত্মরক্ষা করিতে পারিবে তাহার কোন উপায়ই রহিল না।

যেমন মৃত্যু আসন্ন হইলে হস্তপাদাদির প্রান্তভাগ অগ্রেই শীতল হয় এবং তথায় রক্তের গমনাগমন নিবৃত্ত হওয়াতে আর সেই স্থলে নাড়ীর গতি বোধ হয় না, শরীরের মধ্যভাগেই স্পন্দন পর্য্যন্ত নাড়ীর সঞ্চার বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যেমন রোম সাম্রাজ্যের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অমনি তাহার দূর প্রদেশ সমুদায় হইতে রোমক সৈন্যগণ প্রস্থান করিল, আর তথায় প্রত্যাগমন করিল না এবং ক্রমে সংকুচিত-বৃত্ত হইয়া রোমের সন্নিধানেই চতুর্দ্দিক রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছুকাল সচেষ্ট হইতে লাগিল। ৪০৯ খৃঃ অব্দে রোমকেরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করে। তখন স্কটলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চল বাসী "স্কট" এবং "পিক্ট" জাতীয়েরা ব্রিটনদিগকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। ব্রিটনেরা যুদ্ধে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা রোমে পত্র প্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করত এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিল যে, "ভীষণাকার অসভ্য লোকেরা আমাদিগকে সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, সমুদ্র ও আবার ঐ রাক্ষসদিগের সম্মুখে প্রতিহত করিতেছে, আমরা কোথায় যাই কি করি কিছুই বুঝিতে পারি না।" কিন্তু রোমকেরা আপনাদিগের দুঃসময়ে ব্রিটনদিগের বিশেষ উপকার করিতে পারিলেন না। সুতরাং উহারা অগত্যা উত্তরাঞ্চলীয় জলদস্যুদিগের নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঐ জলদস্যুদিগের নাম স্যাক্স,

"রাইন" নদীর মুখ হইতে "এলবনদীর" মুখ পর্যন্ত যে ভূভাগ তাহাতেই ছিল। উহারা "জুট" "আঙ্গল" এবং "স্যাক্সন্" ইত্যাদি বিবিধ নামে প্রসিদ্ধ হয়। "হেঙ্গিষ্ট" এবং "হর্সা" নামক ভ্রাতৃদ্বয় নিমন্ত্রণ পাইয়া বৃটনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অতি অল্পায়াসেই স্কট্ ও পিক্টদিগকে পরাভূত করিয়া সমুদায় নিরুপদ্রব করিল। কিন্তু তাহারা দেশের শোভা ও দেশবাসীদিগের অক্ষমতা দর্শনে আপনারা লোভপরবশ হইয়া বৃটেন ত্যাগ করিয়া যাইতে নিতান্ত অসম্মত হইল। প্রত্যুত উহারা স্বদেশীয় অপরাপর লোকদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল এবং সকলে মিলিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় দেশটী আপনাদিগের অধিকৃত করিয়া লইল।

বৃটনেরা কেল্ট জাতীয় ছিল, স্যাক্সনেরা তাহা ছিল না; উহারা টিউটন জাতীয় লোক ছিল। উহাদিগের সহিত যুদ্ধে বৃটনেরা প্রায় নির্মূলিত হইয়া যায়। কেবল পশ্চিম ভাগে যে পর্বত শ্রেণী আছে তাহাতে কতক লোক প্রস্থান করিয়া রক্ষা পায়। আর কতক ব্যক্তি গল্‌দেশে পলাইয়া বৃটনি নামক তাহার প্রদেশ বিশেষে যাইয়া বাস করে।

সমুদায় দেশ স্যাক্সনদিগের অধিকৃত হইলে উহা প্রথমতঃ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং সেই সময়ে পোপ্ "গ্রীগরী" প্রেরিত "অগষ্টিন্" নামক এক জন সাধু আসিয়া উহাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। স্যাক্সনদিগের পূর্ব্ব ধর্ম্ম অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। উহারা অনেক দেবদেবী মানিত এবং স্বর্গ নরকও স্বীকার করিত বটে, কিন্তু উহাদিগের মতে দেবতা মাত্রেই রণোন্মত্ত,

সর্ব্বদা যুদ্ধ এবং মধ্যে মধ্যে তীব্র মদিরা পান করাই স্বর্গের সুখ অথ যুদ্ধে পলায়ন করিলেই নরকের দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যতদিন উহারা অসভ্য ছিল এবং দস্যুবৃত্তি দ্বারা আপনাদিগের জীবনোপায় করিত তাবৎকাল এইরূপ সংস্কার প্রবল রহিল। কিন্তু যখন উহাদিগের বৃটেন দ্বীপে বাস হইল, কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা সুখ ভোগের সামগ্রী উৎপন্ন হইল এবং নানা প্রকারে অবস্থার পরিবর্ত্ত হওয়াতে মনও কোমল এবং প্রশান্ত হইয়া উঠিল, তখন পূর্ব্বোক্তরূপে কেবল সংগ্রামপর ধর্ম্মপ্রণালী আর আদরের পাত্র হইতে পারিল না। সাক্সনেরা অতি অল্পকালের মধ্যেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহারাই কিয়ৎকাল পরে তাহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আটটী রাজ্য ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়া একত্রীকৃত হয় এবং "এগবর্ট" নামক কোন মহাত্মা ঐ মিলিত রাজ্যের রাজা হন।

এই সাক্সনেরাই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব্ব পুরুষ। উহাদিগের অসভ্যাবস্থাতেই যে সকল রীতি নীতি ছিল তাহাই এক্ষণে পরিপক্ক হইয়া ইংরাজদিগের সুসভ্য রীতি-নীতি হইয়াছে। উহাদিগের রাজা যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। কতকগুলি সুবিজ্ঞ বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্য করিতে হইত, ঐ সভার নাম "উইটিনা গিমট" ছিল। ফলতঃ ঐ সভাই বর্ত্তমান "পার্লিয়ামেন্ট" সভার মূল স্বরূপ বলিতে হইবেক। সাক্সনদিগের ধর্ম্মাধিকরণ এক প্রকার 'পঞ্চায়তের' দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। তাহা হইতেই ইংরাজদিগের মধ্যে জুরি

যেমন স্বাদ ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় দ্বারা এই মাত্র জানা যায়—ইহার অতিরিক্ত কিছুই জানা যায় না।

কিন্তু যে ইন্দ্রিয় দ্বারা হউক না কেন যখন আমরা কোন গুণের প্রত্যক্ষ করি সেই সময়েই ঐ গুণের আধার যে কিছু অবশ্যই আছে এমত প্রতীতি জন্মে। কি জন্য যে ঐ প্রকার প্রতীতি জন্মে তাহা বলিতে, এবং ঐ প্রতীতি যে অবশ্যই সত্য হইবে ইহাও বিচার দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারা যায় না। কিন্তু বিচারদ্বারা সিদ্ধ না হউক, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানা যায় সেইগুলি কেবল গুণ মাত্র এবং ঐ সকল গুণের অবশ্যই কোন আশ্রয় আছে, এতাদৃশ বোধ আমাদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ-সংস্কারমূলক বলিতে হইবে। সুতরাং সহস্র যুক্তি মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু এই প্রতীতির যে কদাপি অন্যথা হইবে এমত বিশ্বাস হয় না।

ফলতঃ আমরা ঐ অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক সংস্কার বশতঃ যে যে আধারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ সমস্ত আছে বোধ করিয়া থাকি, সেই আধারেরই নাম জড়। অতএব এমত বলা যাইতে পারে যে জড় স্বয়ং কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, ইহার গুণ সমস্তই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য।

জড় পদার্থের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-গুণ তিন প্রকার। তাহার মধ্যে প্রথম প্রকারের অন্তর্গত যে দুইটী গুণ আছে তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এমন কি, সেই দুইটী গুণ নাই, অথচ কোন জড় পদার্থ আছে ইহা মনেও ভাবনা করিতে পারা যায় না। এই হেতু ঐ দুই গুণকে জড়ের স্বতঃসিদ্ধ গুণ বলা গিয়া থাকে তাহার একটীর নাম

বিস্তৃতি বা আকৃতি। সকল জড় পদার্থেরই বিস্তার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং বেধ থাকে। কেবল দীর্ঘ অথবা দীর্ঘ এবং প্রস্থ মাত্র, কিঞ্চিন্মাত্রেও বেধবিশিষ্ট নয়, এমত জড় পদার্থ কিছুই নাই, এবং এমন যে কোন জড় থাকিতে পারে তাহা অনুভব করাও যায় না। জড়ের সাধারণ দ্বিতীয় গুণের নাম ইম্পিনিট্রাবিলিটি। এই গুণ থাকাতে প্রত্যেক জড় পদার্থ যে স্থানে থাকে সেই স্থান অন্যের জন্য অধিকৃত রাখে। সুতরাং দুইটী জড় পদার্থ কোন ক্রমেই এক সময়ে এক স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না। ভাবিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, কদাপি জড়ের এই গুণের অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে।

জড়ের দ্বিতীয় প্রকার যে সকল গুণ আছে তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। যদি আমাদিগের কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় মাত্র থাকিত এবং আমরা সচেষ্ট হইয়া জড় পদার্থের প্রতি স্ব স্ব দৈহিক বল প্রয়োগ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে কদাপি এই সকল গুণ অবধারিত হইত না। যেমন চক্ষু না থাকিলে কোন দ্রব্যের রূপ ও বর্ণ কিছুই বুঝা যায় না, তেমনি সমুদায় ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও যদি আমাদিগের দৈহিক বল না থাকিত (অথবা আমরা স্বাধীনরূপে দৈহিক বলের প্রয়োগ করিতেছি এমত বুঝিতে না পারিতাম) তবে, কোন প্রকারেই এই গুণ গুলির পরীক্ষা হইতে পারিত না। এই হেতু এই সকল গুণকে জড়ের পরীক্ষা-সিদ্ধ-গুণ বলা যায়।

তাহার মধ্যে প্রথম গুণের নাম নিশ্চেষ্টতা। জড় পদার্থ

স্থানাবরোধক—অর্থাৎ উহা যে স্থানে থাকে সেই স্থান রুদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু আমরা বল দ্বারা উহাকে পূর্ব্বস্থানচ্যুত করিয়া স্থানান্তরিত করিতে পারি। তাহা করিলেই উহার গতি হয়। অর্থাৎ জড়কে নাড়িলে নড়ে। সকল জড় পদার্থেরই যে এই গুণ আছে ইহাতে আমাদিগের এমত দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, যদিও কদাচিৎ দেখিতে পাই যে, বল প্রয়োগ করিয়া আমরা কোন জড়ের গতি জন্মাইতে পারিলাম না, তথাপি বিবেচনা করি যে কোন শক্ত্যন্তর ঐ স্থলে আমাদিগের প্রতিকূল হইয়াছে, নচেৎ অবশ্যই গতি জন্মিত।

যেমন আমরা বল দ্বারা জড় পদার্থের গতি উৎপাদন করিতে পারি তেমনি উহার গতি আরম্ভ হইলে আবার প্রতিকূল বল দ্বারা সেই গতির নিবারণ করিতেও পারি। এই হেতু এমত সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে, জড়ের গতি উৎপাদন করিতে বলের যেমন আবশ্যকতা উহার গতি নিবারণার্থেও বলের সেইরূপ প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ জড়পদার্থ মাত্রই নাড়িলে নড়ে এবং থামাইলে থামে; কিন্তু তাহারা আপনা হইতে, অর্থাৎ অপরের বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে সচল বা স্থির হইতে পারে না।

জড় পদার্থ মাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণে বিস্তৃতি আছে। কিন্তু আমরা নানা প্রকারে বল প্রয়োগ করিয়া কখন তাহার আয়তন হ্রস্ব ও কখন বা বর্দ্ধিত করিতে পারি। জড়ের যে গুণ থাকাতে উহার প্রতি কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিলে জড় স্বল্পায়তন হইয়া যায়, সেই গুণের নাম সঙ্কো-

কাদম্বরী।

শুক বৈশম্পায়নের বৃত্তান্ত।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন।

একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত [illegible], পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, পূর্ব্বদিক্ রবির ছটায় গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, [illegible] অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি [illegible] দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল [illegible] সরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলী বৃক্ষস্থিত পক্ষি-গণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল। পক্ষিশাবকেরা নিঃশব্দে কোটরে রহিল। কেবল আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছি এমন সময়ে, ভয়ানক মৃগয়াকোলাহল শুনিতে পাইলাম। কোন দিকে সিংহ সকল গম্ভীরস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল; কোন প্রদেশে তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশু সকল বন আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কোন স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তু সকল ছুটাছুটী করিতে লাগিল; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুগণ অতি-বেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুর-ঙ্গের হেষারবে, সিংহের গর্জ্জনে ও পক্ষিগণের কলরবে, বনস্থলী আকুল হইয়া উঠিল এবং তরুগণও ভয়ে কাঁপিতে

লাগিল। আমি সেই কোলাহল শ্রবণে ভয়বিহ্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া পিতার জীর্ণপক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম। এই দিকে ব্যাধদিগের ঐ বরাহ যাইতেছে, ঐ হরিণ যাইতেছে ঐ করভক পলাইতেছে ইত্যাদি নানা প্রকার কোলাহল শুনিতে লাগিলাম।

মৃগয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দিকে কোলাহল হইতেছিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায় বিকট মূর্ত্তি এক সেনাপতি সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ ও কদাকার শবরসৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্ত্তী কালান্তক স্মরণ হয়। সেনাপতির নাম মাতঙ্গক পশ্চাৎ অবগত হইলাম। মুখমণ্ডলে দুই চক্ষু জবাবর্ণ; সর্ব্বশরীরে বিন্দু বিন্দু রক্তকণিকা লাগিয়াছে; সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় শিকারী কুকুর আছে। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন বিকটাকার অসুর বন্য পশু ধরিয়া খাইতে আসিয়াছে। শবরসৈন্য অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, ইহারা কি দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মান্বিত। জনশূন্য অরণ্য ইহাদিগের বাসস্থান, মদ্য মাংস আহার, ধনু ধন, কুকুর সুহৃৎ, ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহিত একত্র বাস এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায়। অন্তঃকরণে দয়ার লেশ নাই, ধর্ম্মের

...ঙ্ক নাই ও সদাচারের প্রবৃত্তি নাই। ইহারা সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই। এই রূপ চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে মৃগয়াজনিত শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা আমাদিগের আবাসতরুতলের ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল। অনতিদূরস্থিত সরোবর হইতে জল ও মৃণাল আনিয়া পিপাসা ও ক্ষুধা শান্তি করিল। শ্রান্তি দূর করিয়া চলিয়া গেল।

দিবাবসানে তপোবনের শোভা।

ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন, রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তরুশিখর হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্ব্বতশিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাসমীরণে তরুশাখা সকল সঞ্চালিত হইলে বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসিলেন, কৃতাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। হূয়মান হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চতুর্...

দ্বিগুণ বাদ্য করিল। হরিদ্বর্ণ কুশ দ্বারা অগ্নিহোত্রবেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলায় দিনকরের ভয়ে গিরি-গুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিল; এই সময় সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহির্গত হইল। সন্ধ্যা অস্ত প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার শোকে দুঃখিত ও তিমিররূপ মলিন-বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে যেই গগন তস্করের ন্যায় ভয়ে লুকাইয়াছিল, অন্ধকার পাইয়া এমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সুধাংশুর অংশ অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রিয়দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্ব দিক্‌ দশনবিকাশ-পূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে। প্রথমে কলামাত্র ক্রমে অর্দ্ধ-মাত্র ক্রমে ক্রমে, সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদায় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীরণ সুখাসীন আশ্রমমৃগগণকে আহ্লাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল। ক্রমে ক্রমে চারি দণ্ড রাত্রি হইল।

যুবা ব্যক্তির প্রতি উপদেশ।

যৌবন অতিবিষম কাল। যৌবনারম্ভ কালে প্রবেশিলে বনজন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবন প্রভাবে মনে এক প্রকার ভ্রম উপস্থিত হয় উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না; যৌবনের আরম্ভে অতি

নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষয়তৃষ্ণা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরাপান না করিলেও চক্ষুর দোষ না থাকিলেও ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান, বিদ্বান ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। পশুস্বরূপ ধনিলোকের ধৈর্য্য নাই। প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপনি সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ, সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্য, যৌবন, প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্য, এ সকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে সভ্য ও বিনীত হয় একথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরাভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? জবাপুষ্প

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে কি প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য উৎপত্তি না, জরা প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়; সেইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতি দুঃখলব্ধ ও অতিযত্নে রক্ষিত হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। রূপবান, গুণবান, বিদ্বান, সদ্বংশজাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র

পাল চরিতেছে, কোন দিকে হরিণ ও হরিণীগণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৌড়তেছে, কোন স্থলে ছাগশাবক প্রস্তরের উপর লম্ফ ঝম্ফ দিয়া বেড়াইতেছে, কোন স্থানে গম্ভীরস্বভাব হস্তী তরুতলের ছায়ায় শয়ন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেছে, কোথাও বা চঞ্চল কপিকুল এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরের শাখায় লম্ফ দিয়া পড়িতেছে, দেখিতে পাওয়া যাইত। পৃথিবীর সমুদায় আশ্চর্য্য বস্তু তথায় সংগৃহীত হইয়াছিল। জগতের সমুদায় সুখ স্বচ্ছন্দ তথায় আসিয়া একত্রিত হইয়াছিল, সংসারের সমুদায় দুঃখ সন্তাপ তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

পুরাবৃত্ত পাঠের উপকার।

কোন বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইলে তাহার কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। মানবগণের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিতে হয়। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি, কোন্ কার্য্য ন্যায়ানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, কোন্ কর্ম্মই বা কেবল ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সেই সেই কর্ম্ম আরম্ভের প্রধান কারণই বা কি? বর্ত্তমান বিষয় যথার্থরূপে জানিতে হইলে অতীত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ, সকল জ্ঞানই তুলনাসাপেক্ষ। আর তুলনা করিয়া না দেখিলে ভবিষ্যৎ বিষয় কিছুই জানা যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিষয়ে মন অধিকক্ষণ ব্যাপৃত থাকে না। আমরা সর্ব্বদা অতীত বিষয় স্মরণ করিয়া থাকি এবং নিরন্তর অনাগত বিষয় চিন্তা করিয়া

মনকে ব্যাপৃত রাখি। শোক, আনন্দ, অনুরাগ, ঘৃণা, আশা, ভয় প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আমাদিগের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হয়। তাহার মধ্যে শোক ও আনন্দ, অতীত ঘটনার কার্য্য-স্বরূপ। ভাবী ঘটনার সহিত আশা ও ভয়ের সম্পর্ক [illegible] অনুরাগ ও ঘৃণাও অতীত বৃত্তান্ত অবলম্বন করে; যেহেতু, কারণ অবশ্যই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে, সন্দেহ নাই।

বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা অতীত কারণের কার্য্য স্বরূপ। আমাদিগের যে সকল ভাল মন্দ ও সুখ দুঃখ ঘটে, তাহার কারণ সন্ধান করিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু পুরাবৃত্ত পাঠ ব্যতিরেকে উহা সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া আমরা অনেক জানিতে পারি এবং বিপদ ও দুঃখ নিবারণের অনেক উপায় শিখিতে পারি। যে সময়ে আমাদিগের হস্তে কেবল আমাদিগেরই রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে, সে সময় আমরা পুরাবৃত্ত পাঠে অমনোযোগী হইলে, বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করা হয় না। আর যদি আমাদিগের উপর রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপ্রতিপালনের ভার সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের পুরাবৃত্ত না জানা অতি অন্যায় ও অনুচিত কর্ম্ম। যে হেতু ইচ্ছাপূর্ব্বক অনভিজ্ঞ থাকা অতি দোষের কথা এবং অনিষ্ট নিবারণের সদুপায় থাকিতেও তাহা অভ্যাস না করিয়া বিপদে পড়া অতি নির্ব্বুদ্ধিতার কর্ম্ম।

পুরাবৃত্তের যে প্রকরণে মানবগণের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ, তর্কশক্তির উন্নতি, বিজ্ঞানশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি, শিল্পশিক্ষাসম্পন্ন জাতির আলোক ও অন্ধকার স্বরূপ জ্ঞান ও অজ্ঞানের

দ্বারা অভিজ্ঞতা বিস্তীর্ণ হয়, যে শিল্পবিদ্যা মনুষ্যমণ্ডল মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে এবং যে দেশে যে শিল্পবিদ্যা অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে তথায় তাহা পরিজ্ঞাত হইবারও সম্ভাবনা। অন্ততঃ আমরা প্রাচীন শিল্পবিদ্যার সহিত বর্ত্তমান শিল্পকৌশলের তুলনা করিয়া দেখিতে পারি এবং ইদানিন্তন শিল্পকৌশলের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে সন্তুষ্ট হই, হ্রাস দেখিলে তাহার পুনঃসংস্কারের চেষ্টা পাই। এই সকল কারণবশতঃ স্থির হইতেছে যে, শিল্পবিদ্যা-প্রভাবে যে সকল অদ্ভুত পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা স্বচক্ষে অবলোকন করা ও তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান লওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

টেলিমেকস।

টেলিমেকসের মনোদুঃখ।

আমি উত্তর করিলাম, হায়! এক্ষণে রাজনীতি পর্য্যালোচনায় প্রয়োজন কি। আমাদিগের ইথাকা নগরী প্রতিগমনের আর আশা নাই। জন্মাবচ্ছিন্নে আর জননী ও জন্মভূমি দেখিতে পাইব না। আর ইহাও একবারেই অসম্ভাবিত নয় যে, পিতা পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন; কিন্তু যদিই দৈবানুগ্রহবলে প্রত্যাগমন করেন, আর তিনি কখনই নন্দনালিঙ্গনরূপ অনুপম আনন্দরসের আস্বাদনে অধিকারী হইবেন না, এবং আমিও রাজ্যশাসনযোগ্য কাল পর্য্যন্ত পিতার আদেশানুবর্ত্তী থাকিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিব না। দেবতারা আমাদিগের প্রতি অনুকম্পাশূন্য হইয়াছেন। অতএব হে প্রিয় বান্ধব! মৃত্যুই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এক্ষণে মৃত্যুচিন্তা ব্যতিরিক্ত আর সকল চিন্তাই বৃথা। আমি শোকে এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম এবং কথনকালে মুহুর্মুহুঃ এমন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম যে, আমার বাক্য প্রায় বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু মেন্টর উপস্থিত বিপদে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইয়াছেন এরূপ বোধ হইল না। তিনি কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি মহাবীর ইউলিসি

মিসরদেশের প্রাচীন অবস্থা।

তদনন্তর মেণ্টর কহিলেন, টেলিমেকস! দেখ মিসর দেশের কি অনুপম শোভা! দর্শন মাত্র বোধ হয়, কমলা সর্ব্ব কাল বিরাজমানা আছেন। এই দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র নগর, ঐ সকল নগরে কি সুন্দর শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, ধনবান দরিদ্রের উপর ও বলবান দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারে না। বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের রীতি কি উত্তম! তাহারা বশ্যতা, পরিশ্রম, সদাচার, ও বিদ্যানুরাগ নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকে। পিতা মাতারা ধর্ম্মনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষিতা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা, অকপট ব্যবহার, ও দেবভক্তি এই সমস্ত গুণের বীজ শৈশবকালাবধি স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগের অন্তঃকরণে রোপণ করিতে আরম্ভ করেন। এই মঙ্গলকর নিয়মাবলী অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজা এইরূপ সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন, তাঁহার প্রজারাই যথার্থ সুখী; কিন্তু যে ধর্ম্মপরায়ণ রাজার দয়া দাক্ষিণ্যগুণে অসংখ্য লোকের সুখ সংবর্দ্ধিত হয়, এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবলতানিবন্ধন যাঁহার হৃদয়কন্দর নিরন্তর অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত থাকে, তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক সুখী। তাঁহাকে দুরাচার নরপতিদিগের ন্যায় ভয় দেখাইয়া প্রজাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয় না, প্রজারা নিজেই তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া বশীভূত থাকে এবং তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আপনাকে

চরিতার্থ বোধ করেন। তিনি প্রজাগণের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য করেন। প্রজারা তাঁহাকে এরূপ স্নেহ ও ভক্তি করে যে তাঁহাদিগের তদীয় রাজ্যভঙ্গের অভিলাষ করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার মর্ত্তাতা চিন্তা করিয়া সাতিশয় কাতর হয় এবং যদি আপন আপন জীবন দিলে তিনি চিরজীবী হইতে পারেন তাহাতেও পরাঙ্মুখ হয় না।

রামকমল ভট্টাচার্য্য।

বেকন।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক নিয়ম শাস্ত্রে উক্ত নাই আপনিই বুঝিয়া লইয়া চলিতে হয়। সকলের ধাতু সমান নহে, এক প্রকার আচারে সকলের সহ্য হয় না, সুতরাং কিরূপ আচার করিলে শরীর সুস্থ বা অসুস্থ হয়, ইহা অনেক স্থলে আপনাকেই অনুভব করিয়া লইতে হয়। যেরূপ আচার তোমার ধাতুতে সহিল না দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্জ্জন করিবে। কিন্তু এক্ষণে কিছু অনিষ্টকর হইতেছে না বলিয়া তোমার পক্ষে পথ্য মনে করিও না। যৌবনাবস্থায় রক্ত সতেজ থাকে, তখন কোন অত্যাচারের ফল হঠাৎ টের পাওয়া যায় না, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় রক্তের জোর কমিলে সেই অত্যাচারের ফলস্বরূপ একেবারে নানা রোগে ধরে। আহারের নিয়মে অকস্মাৎ পরিবর্ত্ত করিও না। যদি কখন এরূপ করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে অন্যান্য বিষয়েও অনুরূপ পরিবর্ত্ত দ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে।

আহার নিদ্রা শ্রম প্রভৃতির বর্ত্তমান ব্যবস্থানিবন্ধন যদি কোন অসুবিধা বোধ হয়, তবে অল্পে অল্পে তাহা পরিবর্ত্ত কর। আবার পরিবর্ত্তনিবন্ধন যদি অসুখ হয়, তবে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত ব্যবহার করিবে। তোমার ধাতুতে কি সহ্য বা অসহ্য হয়, তুমি ভিন্ন অন্যের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

ব্যায়াম আহার ও নিদ্রার সময় নিয়ম ও প্রণালী রাখা অতি আবশ্যক। উৎকট ভয়, উদ্বেগ, দ্বেষ, অসূয়া, ক্রোধ, দৌর্ম্মনস্য চিন্তা, অতিশয়োল্লাস ও অনির্ব্বেদিত আধি, প্রযত্ন পূর্ব্বক পরিহার করিবে। এক প্রকার আমোদে আসক্ত হইও না। বিবিধ কলা চিত্র ইতিবৃত্ত ও উপাখ্যান প্রভৃতি সাহিত্য আমোদ দ্বারা চিত্ত প্রফুল্ল রাখিবে। যে সকল উদাত্ত ভাব পর্য্যালোচনায় মন বিকসিত ও বিস্ফারিত এবং যেরূপ উৎফুল্লিত হয়, তাহাতেও মনোনিবেশ করিবে। একেবারেই ঔষধ পরিবর্জ্জন করিও না, তাহা হইলে নিতান্ত আবশ্যক হইলেও ঔষধ খাটিবে না। অনবরত নিরবকাশ ঔষধ খাওয়া অভ্যাস করিলে পীড়ার সময় তাহাতে কিছু ফলোদয় হইবে না। ঔষধ সেবনের অভ্যাস না রাখিয়া আহারের ব্যবস্থাবিষয়ে সবিশেষ সাবধান থাকা উচিত। পথ্যাগমে প্রাচীন রোগের যেরূপ উপশম হয়, ঔষধে সেরূপ নয়।

শরীরে কোন আকস্মিক বৈগুণ্য দেখিলে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, তদ্বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তির মত অনুসন্ধান করিবে। পীড়ার সময় শুদ্ধ আরোগ্য লাভই পরমার্থ মনে করিবে, তখন ক্ষণিক সুখানুরোধে অপথ্য বিষয়ে লোভ করিও না। সুস্থদশায় শ্রমে বিমুখ হইও না। শরীর কষ্টসহ হইলে কোন রোগেই কাবু করিতে পারে না।

স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইবে, কিন্তু রাত্রি জাগরণেরও অভ্যাস রাখিবে। পর্য্যাপ্ত ভোজন করিবে, কিন্তু লঙ্ঘনেও কাতর হইবে না। প্রতিদিনই শ্রম করিবে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিশ্রা-

যেরও অভ্যাস রাখিবে। এইরূপ সদ্ আচরণই আয়ুষ্য ও স্বাস্থ্যকর। অনেক চিকিৎসক আরোগ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ রোগীর রুচি অনুবর্ত্তন করে। আবার কেহ কেহ রোগীর ধাতু ও প্রকৃতি বিশেষের অনুরোধে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতির কেশমাত্রও অতিক্রম করে না। উভয়েই নিন্দনীয় ও অকর্ম্মণ্য। একজন মধ্যবৃত্তি চিকিৎসক বাছিয়া লও। যদি একজন না মিলে তবে দুই প্রকার দুই জন মনোনীত কর। চিকিৎসক মনোনীত করিবার সময় জাতযশের গৌরব করিও না। তোমার ধাতুবিশেষ বুঝিতে অসমর্থ হইলে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও কিছু করিতে পারিবেন না।

সন্তান।

সন্তানের নানা প্রকার সুখ আছে বটে, কিন্তু দুঃখও বিস্তর। আত্মবিম্ব স্বরূপ কতিপয় পুত্রকন্যা সংবেষ্টিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অন্তঃকরণে এক প্রকার স্বসংবেদ্য সন্তোষ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু আবার সন্তান কুম দুর্ব্বৃত্ত বা অবাধ্য হইলে সংসার ক্লেশাগার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতি গুণবান ও প্রিয়ম্বদ হইলে নানা অমঙ্গলাশঙ্কায় সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত থাকিতে হয়, কখন কি হয় এরূপ উদ্বেগ অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক থাকে। সন্তান থাকিলে সাংসারিক ব্যাপারে পরিশ্রম করিতে কষ্ট বোধ হয় না, কিন্তু দুঃখের দশায় সন্তানের দুঃখ দেখিলে নিজ দুঃখ দ্বিগুণতর বোধ হয়। সন্তান থাকিলে সাংসারিক চিন্তা ও উদ্বেগ অনেক

পরিরক্ষিত হয়, আবার সন্তান জীবিতবাম রাখিয়া মরিতে পারিলে মৃত্যুভয় অনেক লঘুকৃত হয়। সন্তানবান অপেক্ষা নিঃসন্তান লোকদিগকে অনেক মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগের বাহ্য শরীরের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় নাই, অনেকাংশে তাঁহারাই অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব স্বরূপ যশ অনুষ্ঠানে চিরস্মরণীয় চিহ্ন দেদীপ্যমান রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। নিরপত্যেরা প্রায় দেবালয় বিদ্যালয় আবসথ আরোগ্যশালা প্রভৃতি পরমার্থানুষ্ঠানার্থ বিত্ত বিনিয়োগ করেন।

বহুসন্তান স্থলে পিতা মাতা সকলকে সমান স্নেহ করেন না। প্রধানতঃ মাতা সন্তানবিশেষে অন্যায় পক্ষপাত প্রকাশ করেন। পিতার প্রযত্নে পুত্র ক্ষমতাশালী হয় এবং মাতার আদরেই দুর্দ্দান্ত ও দুর্নিয়ন্ত্রিত হয়। বহু সন্তান স্থলে প্রায়ই দেখা যায় যে প্রথমোৎপন্ন সন্তানগুলি একান্ত দুর্লালিত ও অবিনেয় হয়, কিন্তু অনাদর লালিত ও উপেক্ষিতপ্রায় সন্তানগুলি বড় হইয়া পরিণামে লোকসমাজে গণনীয় হইয়া থাকে।

সকল স্থলেই সন্তানের আদর শুনা অপরামর্শ বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে নিতান্ত কার্পণ্য প্রকাশ করাও উচিত নহে, তাহা হইলে নীচের সহিত সংসর্গ, অপথরণে আসক্তি ও নানা কুৎসিত কল্পনায় প্রবৃত্তি জন্মে। বাল্যকাল অতি কষ্টে অতিবাহিত হইলে পর যৌবনে বিষয় হস্তগত হইলে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে, তখন চিরনিরুদ্ধ ভোগেচ্ছা উদ্দাম বেগে বিজৃম্ভিত হইয়া একেবারে মানবকে আসিয়া ধরে।

অতএব বালস্বভাবসুলভ কোন কোন মনোরথ সাধন করা
বিধেয়। যে পিতা মাতা যে সেবক বা যে শিক্ষক বিনয়লো-
দেশে ভ্রাতৃগণের মধ্যে অন্যান্য জিগীষা বা স্পর্দ্ধা উত্তে-
জিত করে, তাহারা অতি নির্ব্বোধ। উহাতে তৎকালে
সৌভ্রাত্র উন্মূলিত হইয়া উত্তরকালে গৃহবিচ্ছেদের বীজ
নিক্ষিপ্ত হয়। পিতার উচিত, পুত্রের বাল্যাবস্থায় প্রবৃত্তি
আলোচনাপূর্ব্বক অভিমত বৃত্তি বা ব্যবসায় মনোনীত করেন
এবং তখনই তদনুরূপ শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তখন
প্রকৃতি অতি কোমল থাকে, অক্লেশেই অভীষ্ট বিষয়ে লওয়া-
ইতে পারা যায়। তখন বালকের অভিরুচি, বা প্রকৃতি-
বিশেষের ঐকান্তিক অনুরোধ রক্ষা করা অকর্ত্তব্য। তৎ-
কালে এমত মনে করা উচিত নহে যে বালকের প্রবৃত্তি যে
দিকে নিসর্গতঃ প্রধাবিত হয়, সেই দিকেই অনায়াসে পরিপক্ক
রূপে শিক্ষা করিবে। বালকের স্বভাব অতি চঞ্চল, কোন
দিকে নিশ্চল বা দৃঢ় অভিনিবেশ থাকে না, সুতরাং
তখন কোন বিষয়ে ক্ষণিক অভিনিবেশমাত্র দর্শনে
প্রকৃতিবিশেষ অনুমান করিয়া তাহার পরকালে জলাঞ্জলি
দেওয়া অতি মূঢ়ের কর্ম্ম। কিন্তু যদি পুত্রবিশেষে অসন্দিগ্ধ
লিঙ্গ দ্বারা তাহার প্রবৃত্তিবিশেষ অতি উৎকট বোধ হয়,
সেখানে তাহার কোনরূপ প্রতিরোধ করা বিধেয় নহে।
কিন্তু সামান্যাকারে এরূপ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে,
পারে যে, যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে উত্তরকালে বিপুল
বিভব ও মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে, অতি
যত্নপূর্ব্বক সন্তানকে তাহাতেই নিয়োজিত করা উচিত,

উক্ত প্রকারে পাঠ.. কষ্টসাধ্য হইলেও অভ্যাসবশতঃ চরমে সুসাধ্য ও সহজ হইবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

রাজশাসন।

পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে রাজশাসনের যে রীতি ছিল তদ্বিবরণ কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য পালন করিতেন। রাজা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন, তাঁহার উপর আর কেহ কর্ত্তা থাকিতেন না। কেবল দেবতা দ্বিজ ও শাস্ত্র তাঁহার সম্ভ্রমের-বস্তু ছিল, ইহাদিগকেই তিনি মান্য করিতেন।

রাজার এই ধর্ম্ম ছিল তিনি দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করিতেন। কোন শত্রু রাজ্য আক্রমণ করিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্যরক্ষা করিতেন। মিত্রের প্রতি মৈত্র ব্যবহার, ও ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা করিতেন। ব্রাহ্মণেরা যে ধর্ম্ম ও জ্ঞান উপদেশ দিবেন তাহা শুনিবেন, ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হইবেন না, রাজকর্ম্মে আলস্য করিবেন না, এবং ক্রোধকে বশীভূত রাখিবেন। রাজকর্ম্ম সম্পাদনার্থ সাত জন মন্ত্রী থাকিতেন। রাজা আপনি এই মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিতেন। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রীদিগের মধ্যে প্রধান থাকিতেন, রাজা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। তিনি উপদেশক স্বরূপ থাকিতেন। ইহা ভিন্ন আর আর রাজকর্ম্মকারক থাকিতেন, তন্মধ্যে গুণী জ্ঞানী কর্ম্মদক্ষ দেশকালাভিজ্ঞ সাহসী নির্লোভী এবং দূরদর্শী মিষ্টভাষী একব্যক্তি থাকি-

তেন, ইঁহার উপাধি দূত, ইনি অন্যদেশ সম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

রাজ কর্ম্মের নিয়ম।—রাজা স্বয়ং রাজ্য ও রাজস্বসম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। সেনাপতি সেনাগণের অধ্যক্ষতা করিতেন। যুদ্ধ বা সন্ধি কর্ম্ম দূতদ্বারা সম্পাদিত হইত। কাহার দণ্ড হইলে বিচারসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকেরা নিষ্পাদন করিতেন। এই সকল কর্ম্ম রাজকর্তৃত্বাধীন ছিল; কিন্তু অন্য কোন কর্ম্মানুরোধে অনবকাশ হইলে মন্ত্রীর প্রতি ঐ সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিতে পারিতেন।

গ্রামের কর্ম্ম গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত। ইঁহারা কেহ দশ, কেহ শত, কেহ সহস্র গ্রামের কর্ত্তা ছিলেন। ইঁহাদিগের উপর এক এক জন অধ্যক্ষ থাকিতেন। অধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগের স্থানে আপন আপন অধীন প্রজাদিগের ভুক্তি স্থির সংবাদাদি জ্ঞাপন করিতেন।

রাজা স্বয়ং এই সকল গ্রামস্থ প্রধান ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন। ইঁহাদের বেতন সম্বন্ধে এই নিয়ম ছিল—দশ গ্রামের অধ্যক্ষ দুইখানি লাঙ্গলে যে পরিমাণ ভূমির চাষ হইতে পারে তাহা পাইবেন। শতগ্রামের অধ্যক্ষ একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের ভূমি ভোগ করিবেন। এবং সহস্র গ্রাম বা শহরের অধ্যক্ষ একখানি বৃহৎ গ্রাম বা শহরের ভূমি পাইবেন। ইহা ভিন্ন দেশের এক এক ভাগে সেনা থাকিত, এবং প্রত্যেক স্থানে এক এক জন সেনাপতি থাকিতেন, ইহারা সর্ব্বদা শত্রুচক্র হইতে দেশ রক্ষা করিতেন। রাজস্ব সম্বন্ধে এই নিয়ম ছিল, ভূমিতে যে শস্য উৎপন্ন হইবে

তাহার ব্যয় বিবেচনা করিয়া রাজা কাহার দ্বাদশ, কাহার অষ্টম, কাহার ষষ্ঠাংশের এক অংশ, রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে চারি অংশের এক অংশ পর্য্যন্ত লইতে পারিতেন। স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন ও পশ্বাদির উপর পঞ্চাশৎ অংশের একাংশ, ধান্যাদিতে পঞ্চমাংশের একাংশ লইতেন। বৃক্ষ, মাংস, মধু, পর্ণ ও আর আর সুগন্ধীয় দ্রব্যের ষষ্ঠাংশের একাংশ পাইতেন। ইহা ভিন্ন বাণিজ্যের লভ্য বিবেচনা করিয়া রাজা তাহার পঞ্চমাংশের একাংশ পাইতেন; কোন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজা তাহার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু কোন স্বামিহীন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে ঘোষণা দেওয়া যাইত ঐ দ্রব্যের স্বামী তিন বৎসরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহা লইয়া যায়। তাহা না হইলে তাহা রাজসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। এবং যদি খনন করিয়া কে ধাতু পাওয়া যাইত, ভূস্বামী তাহার অর্দ্ধেক পাইতেন, কেননা ভূস্বামী তাহার অর্দ্ধেকের ভাগী। এতদ্ভিন্ন কোন কোন দ্রব্যের পক্ষে এমন নিয়ম ছিল, রাজা তাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে অন্য কোন ব্যক্তি ক্রয় করিতে পারিবে না।

রাজধানী ও রাজসভা।—শাস্ত্রে লেখে রাজ্যের মধ্যে যে স্থান অতি উর্ব্বর, অথচ যে স্থানে শত্রু অনায়াসে প্রবেশ করিতে না পারে, কিম্বা আসিলে স্বচ্ছন্দ হইয়া থাকিতে না পারে, এমন স্থানে রাজধানী করিবেন। এবং চতুর্দ্দিকে দুর্গ, মধ্যে রাজালয় নির্ম্মাণ করিবেন। তাহার চতুর্দ্দিকে বারি ও বৃক্ষ, দুর্গ রক্ষার উপযুক্ত সেনা, এবং তাহাদের আহার দ্রব্য

সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিলে রাজসভা উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত হইবে।

রাজা চতুর্থ প্রহর রাত্রির সময় গাত্রোত্থান করিয়া পূজাদি করণানন্তর সভায় বসিবেন, এবং সকলের সহিত সদালাপ করিবেন। তৎপরে নির্জ্জন স্থানে মন্ত্রীদিগের সহিত রাজকর্ম্মের মন্ত্রণা করিবেন। অনন্তর স্নান আহারাদি করিয়া গৃহকর্ম্ম দেখিবেন। তৎপরে বিশ্রাম করিয়া বৈকালে সৈন্যগণের শিক্ষা দর্শন করিবেন। তদনন্তর সায়ংসন্ধ্যা। পরে দেশের কোথায় কি হইতেছে তাহার সংবাদ শুনিবেন। অনন্তর আহারাদির পর সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া নিদ্রা যাইবেন।

রাজনীতিজ্ঞেরা—রাজ্যের অতি নিকটস্থ রাজারা শত্রু মধ্যে গণ্য। তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী রাজারা মিত্রশ্রেণীতে গণ্য। অতি দূরদেশবাসী রাজগণ শত্রু মিত্র কিছুর মধ্যেই নহেন। শত্রু দমনের চারি উপায় লেখা আছে—প্রথম তাহাদিগকে ভেট দিয়া বশীভূত করিবেন, দ্বিতীয় তাহাদের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবেন, তৃতীয় সন্ধি, ও চতুর্থ যুদ্ধ। ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ উপায় উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

শুভকরী।

লিস্‌বনের ভূমিকম্প।

লিস্‌বন নগরে, ১৭৫৫ অব্দের ১ লা নবেম্বরের পূর্ব্বাহ্ণের ন্যায় মনোহর পূর্ব্বাহ্ণ আর কখনই নয়নগোচর হয় নাই।

বিরল হইয়া পড়িল, তখন দেখি যে ধূলিধূসরিত, ভয়বিবর্ণ ও কম্পান্বিত-কলেবর এক স্ত্রী একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া আমার গৃহতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। দেখিবামাত্র আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? কিরূপে এখানে উপস্থিত হইয়াছ? সে ভয়ে এমনই অভিভূত যে আমার প্রশ্নের কোন উত্তরই প্রদান করিতে পারিল না; কেবল অতি কাতর স্বরে কথঞ্চিৎ আমাকে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! আপনি কি বোধ করেন, আজি কি পৃথিবীর প্রলয় কাল উপস্থিত?" এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়া উঠিল মহাশয়! এ কি, আর যে নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না, তৃষ্ণায় হৃদয় বিদীর্ণ প্রায়, যদি আপনি কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ জল প্রদান করেন তবেই রক্ষা। তখন আমি জল কোথায় পাইব, সুতরাং তাহাকে কহিলাম, ইহা পিপাসাশান্তি-চিন্তার সময় নহে, জীবন রক্ষার উপায় চিন্তনে তৎপর হও, এই বাটী আমাদের মস্তকে পতিত হইয়াছে বলিলেই হয়, দ্বিতীয় বার কম্পন উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে, আইস এখান হইতে পলায়ন করি।

এই কথা বলিয়া আমি সত্বর সিঁড়ীর নীচে ধাবমান হইলাম। সেই ভয়বিহ্বল অবলাও আমার বাহু অবলম্বন করিয়া অনুগমন করিতে লাগিল। যে পথটি বাটী হইতে সরল ভাবে টেগস্ নদীতীরে মিলিত হইয়াছে, আমরা সেই পথই অবলম্বন করিয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি যে, রাশীকৃত পতিত গৃহের ভগ্নাবশেষে উহা এক বারে রুদ্ধ

নীরূপভাবে পিষ্ট ও ক্ষতবিক্ষতশরীর হইয়াছে যে, তাহারা কোন ক্রমেই উপস্থিত সাক্ষাৎ কালান্তকের হস্ত অতিক্রম করিবার নিমিত্ত একপদও চলিতে পারিতেছে না।

যাহা হউক ভূমিকম্পকে প্রকৃতরূপ প্রথম নিদর্শন, সুতরাং আমি যথাশক্তি দ্রুত গমন করিতে লাগিলাম; কিয়ৎক্ষণ পরে সেণ্টপলের গির্জার সম্মুখস্থ এক প্রশস্ত ভূভাগে উত্তীর্ণ হইয়া একপ্রকার নিরাপদ হইলাম। আমার উপস্থিতির অনেক পূর্ব্বেই গির্জাটি ভূতলশায়ী হইয়া বহুসংখ্যক জীবের জীবন সংহার করিয়াছে। আমি অল্প ক্ষণ মাত্র তথায় দণ্ডায়মান হইয়া অতঃপর কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। নদীতীরই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান স্থির করিয়া দিয়া [illegible] পার্শ্বস্থ স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া কথঞ্চিৎ নদীতটে উত্তীর্ণ হইলাম, দেখিলাম, নানাশ্রেণীস্থ অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ তথায় সমবেত হইয়াছে, সকলেরই মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ, কেহ কেহ জানুপাত পূর্ব্বক বক্ষস্তাড়ন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

জীবিত রক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া সকলেই এইরূপ কাতর ধ্বনি করিতেছে এমন সময়ে দ্বিতীয় বার ভূকম্প আরম্ভ হইল। যদিও ঐ কম্পন অপেক্ষাকৃত অল্প ভীষণ ভাবে আবির্ভূত হইল, তথাপি উহার আঘাত দ্বারা পতিতাবশিষ্ট যাবতীয় দোলায়মান অট্টালিকাই এক কালে উন্মূলিত হইয়া পড়িল, নগরের চতুর্দ্দিকেই করুণ কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ সময়েই আবার একটী পল্লীস্থ গির্জা পতিত হইয়া বহুসংখ্যক হইয়া

তৎক্ষণাৎ তরুভিমুখে সত্বর পলায়ন করিলাম। উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই রহিলাম। দেখিলাম, সম্মুখবর্ত্তী নদীমধ্যে যাবতীয় পোত প্রচণ্ড বাত্যাহতের ন্যায় নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত ও নিঃক্ষিপ্ত হইতেছে, কতকগুলি পোত ছিন্ন-বন্ধন হইয়া নদীর অপর পারে ভাসিয়া যাইতেছে; কতক-গুলি প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছে; আর কতকগুলি বৃহৎ-পোত এক কালে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তখন তথায় কিছুমাত্র বায়ুর প্রাবল্য লক্ষিত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে কতকগুলি পোতারোহীর মুখে শুনিলাম যে, যে সময়ে আমি পোতশ্রেণীর উক্তরূপ দুর্গতি দেখিতেছিলাম, সেই সময়ে তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটী নূতন প্রস্তর বদ্ধ সুদৃঢ় তীরভূমি এককালে জলসাৎ হইয়াছিল। নিরাপদ ভাবিয়া বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও জলকবলিত কালের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ঐ সময়ে আরও কতকগুলি লোক জীবনরক্ষার্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল; কিন্তু সেই সমস্ত হতভাগ্য জীবপূর্ণ যাবতীয় নৌকাই ভীষণ আবর্ত্ত তুল্য প্রবল জলস্রোতে নিমগ্ন হয়। প্রত্যক্ষ গণের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন যে, দ্বিতীয় কম্পন কালে প্রথমোত্থিতবাত্যাহত সমুদ্রের ন্যায় সমুদায় নগরটী এক এক বার পশ্চাৎ ও এক এক বার সম্মুখে চালিত হইয়াছিল এবং নদীগর্ভে ভূকম্পের একরূপ প্রাদুর্ভাব উপ-স্থিত হইয়াছিল যে, যাবতীয় নোঙ্গর এককালে ভাসিয়া উঠিল, আর সেই সময়েই নদীর জল সহসা প্রায় ১৩।১৪ হাত স্ফীত হইয়া ক্ষণমধ্যেই পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল।

অতি উজ্জ্বল আলোকমালায় আকীর্ণ হইয়া উঠিল। এমন কি ঐ আলোকে অনায়াসে পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারা যাইত। দেখিতে দেখিতে নগরের নানা স্থান হইতে যুগপৎ শত শত অগ্নিশিখা সমুত্থিত হইল। হতাবশিষ্ট হতভাগ্য নগরবাসীরা উপর্য্যুপরি আকস্মিক বিপৎপাত দর্শনে ভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িল যে উহার নির্ব্বাপণার্থ কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে পারিল না। সুতরাং ঐ অবারিত হুতাশন ক্রমাগত কয় দিন ধরিয়া সমভাবে জ্বলিতে লাগিল। এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও উহার বিরাম ছিল না। ঐ অগ্নিরাশি অষ্ট দিনে নগরের যাবতীয় পতিতাবশিষ্ট গৃহ সকল একবারে ভস্মীভূত করিল।

আমি প্রথমে মনে করিলাম ভূকম্পকালে [illegible] ভৌমাগ্নি উত্থিত হইয়াই এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে নবেম্বর মাসের প্রথম দিন, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের এক অতি পুণ্য পার্ব্বণ। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে নগরবাসিগণ যাবতীয় দেবালয়ে আলোক প্রদান করে। তন্মধ্যে এক একটি গির্জ্জায় [illegible]টী দীপ প্রদত্ত হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে তৃতীয় ভূকম্পন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার আঘাতে আলোকগুলি বিক্ষিপ্ত মশারি, যবনিকা গবাক্ষ প্রভৃতি নানা পদার্থে অগ্নি সংলগ্ন হয়; সুতরাং তৎসমুদায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অনন্তর ঐ দহ্যমান দেবালয় হইতে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া সন্নিহিত গৃহান্তরে সংলগ্ন হয়। এই রূপে ক্রমে ক্রমে পতিতাবশিষ্ট যাবতীয় অট্টালিকাই ভস্মীভূত হইয়া যায়।

আপনার পরীক্ষা ভিন্ন অন্যোপায়ে মনুষ্য ভাষা ও লিপি-দ্বারা এক কালের প্রকাশিত সুনিয়ম সকল অপর কালে অনায়াসে জানিতে পারিবায় পরীক্ষা না করিয়া ঐ সুনিয়মের ফলভোগ করিতে সক্ষম হওয়াতে ক্রমশঃ অতি উত্তমরূপে উন্নত প্রাপ্ত হইতেছে। পশুরা কেবল স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা চালিত হইবাতে, ও স্বকীয় পরীক্ষার ফল প্রচার করিতে অক্ষম হওয়াতে সর্ব্বদা একাবস্থায় থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধির কখন বৃদ্ধি হয় না। প্রথম সৃষ্ট মৌমাছী যে প্রকার [illegible] তার সহিত চাক বানাইয়াছিল, এইক্ষণকার মৌমাছীরাও তন্নির্ম্মাণে তাহাহইতে অধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করে না। ঐ নৈপুণ্যও তাহাদের পরীক্ষার ফলহইতে সমুৎপন্ন নহে— কেবল স্বভাব-দত্ত-জ্ঞানসম্ভূত। পরীক্ষার ফল হইলে তাহার ক্রমশঃ উন্নতি হইত। [illegible] পশু সর্ব্বদা সমভাবে আছে। মনুষ্যের রীতি তদ্রূপ নহে। দেখ প্রাচীন অসভ্য ব্রিটনদিগের কুটীর হইতে এইক্ষণকার সভ্য ইংরাজদিগের অট্টালিকা কত সহস্র গুণে উত্তম।

[illegible] সর্ব্বত্র উপনীত হইবাতে স্থানভেদে সভ্যতার তারতম্য হইয়া থাকে। অসভ্য মনুষ্য বনে মৃগয়াদ্বারা পশু ও তরুতা বৃক্ষের ফল আহরণ করিয়া জীবনধারণেই [illegible] করে; এবং সর্ব্বদা পশুর অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিয়া ও [illegible] আপন অপত্যদিগকে শিক্ষা দিবার ও বিদ্যার অনুশীলন করিবার সময় না থাকা প্রযুক্ত তৎকার্য্যে মনোযোগ করে না। আপনাদের বসবাসের কুটীর ও ডোঙ্গা নির্ম্মাণ ব্যতীত অন্য কোন শিল্পকার্য্য শিক্ষা, কিম্বা পরিচ্ছদ কারণ পশুচর্ম্ম এবং

ফলমূল ব্যতীত অন্য কোন বস্তু সংগ্রহ করে না। তৎপরে গো অশ্ব ও মেষাদিকে প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের দুগ্ধে ও মাংসে অক্লেশে পুষ্ট হইবার এবং তাহাদিগকে চারণ করিতেও অধিক কালব্যয় না হইবায় মনুষ্যের যথেষ্ট অবকাশ হয়। ঐ অবকাশে স্বভাবতঃ কর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তিরা নিজ নিজ মেষাদির লোমদ্বারা বস্ত্র-বপন করিতে নিযুক্ত হয়; এবং গৃহ-নির্ম্মাণ করিতেও যথেষ্ট অবকাশ পাইয়া অধিক কালব্যয়দ্বারা সমধিক পরিশ্রমে নৈপুণ্য প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকার কার্য্যে সকল মনুষ্য সম পরিশ্রম ও আগ্রহ প্রকাশ করে না, সুতরাং মনুষ্যের অবস্থার প্রভেদ হয়। যে ব্যক্তিরা বহু-পরিশ্রম করত উত্তম গৃহ ও নানাপ্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে, তাহারা অবশ্যই অন্য হইতে মান্য ও আদরণীয় হয়; এবং আপন আপন উত্তম গৃহ সকলের সৌন্দর্য্য-রক্ষার্থ তাহারা তত্রস্থ স্থান পরিষ্কৃত করিয়া স্ব স্ব প্রয়োজনীয় ও মনোভিমত আদরণীয় ফল-পুষ্পের বৃক্ষ রোপিত করে। এই প্রকারে আদিম অসভ্যেরা প্রথমে রাখাল, পরে কৃষক হইয়া পূর্ব্বের ভ্রমণতৎপরাবস্থা ত্যাগ করত পরস্পর নিকটে নিকটে দলবদ্ধ থাকিয়া গ্রামস্থ হয়। তদনন্তর তাহারা কৃষি-কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগদ্বারা আপন আপন ক্ষেত্র হইতে অধিক ফলের লাভ করাতে উদ্বৃত্ত ফলে স্ব স্ব জ্ঞাতি-পরিজন-প্রতিপালনে উত্তমরূপে পারগ হয়। ঐ জ্ঞাতিপরিজনেরাও আপন আপন পরিশ্রমদ্বারা কেহ কৃষিকর্ম্মে, কেহ মেষাদি চারণে, কেহ বস্ত্রবপনে, কেহ গৃহ-নির্ম্মাণাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া গৃহ-স্বামিদিগের সম্পত্তি তথা বল ও আধি-

জ্যের বৃদ্ধি করে। কেহ কেহ বা শিল্পবিদ্যা জ্যোতি-
র্বিদ্যাদিতে মনোনিবেশ করত সভ্যতার বৃদ্ধি করিতে থাকে।
এইরূপে এক জনের অনাবশ্যক কোন বস্তু অন্যের অন্য
কোন বস্তুর সহিত পরিবর্ত্তন করাতে বাণিজ্যের অঙ্কুর উৎ-
পন্ন হয়, এবং পরে পরে বাণিজ্যের বৃদ্ধিতে এক দেশের
বস্তু অন্যদেশে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত বৃহন্নৌকাদি প্রস্তুত
করা হয় এবং তাহাকে চালিত করিবার নিমিত্ত জল, বায়ু,
নদী, সমুদ্র, আকাশ, নক্ষত্রাদির স্বভাব গতি ও প্রকৃতির
অনুসন্ধান হইতে থাকে। তদর্থে পরস্পর সুশীলতা ও নম্রতা
ও শিষ্টতা ও সৌজন্যের প্রকাশ, ও বিদ্যার আলোচনা
করিতে যাহাদিগের যে প্রকার আগ্রহ হইয়াছে, তাহারা
সেই প্রকার সভ্যতা ও স্বচ্ছন্দতা ও সুখভোগ করিতেছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ।

যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণ সমক্ষে লক্ষ ভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম-প্রভাবে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ বলরাম তাদৃশ ঘৃণিত ও নিন্দিত কার্য্য উপেক্ষা করিয়া পরম সখ্যতা-ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী দুঃখিতা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত নির্ব্বোধ দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে

পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিরাট নগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ-পাণ্ডব প্রচ্ছন্ন বেশে অজ্ঞাত বাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ স্বসুতা উত্তরাকে অলঙ্কৃতা করিয়া অর্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং অর্জুনও আপনার পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, পরাজিত, নির্ধন, নির্বাসিত ও স্বজন বহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যিনি এক পদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ, যাহার কার্য্যের উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অর্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন দশ সহস্র লোকের প্রাণ সংহার করিয়াও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব স্বপক্ষীয় অসংখ্য লোককে

বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট-কলেবর শত্রুপক্ষদিগের সুতীক্ষ্ণশর-জালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুন-বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করত পরম সন্তোষলাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রুসমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছে, এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত

থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত জলস্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী [illegible], তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি [illegible] পুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীর প্রসুপ্ত [illegible] আচ্ছাদিত ও [illegible] করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

দুর্গেশনন্দিনী।

দেবমন্দির।

---

৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন এক জন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষ কালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমত ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য-পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্বরজ্জু শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছা গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিয়া ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্য সংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে অত্যুচ্চ ধব-

হূর্ত্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথায় যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা নির্ব্বাণ হইয়া গেল। মন্দির মধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, প্রবেষ্টা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না! আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবা পুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেব-মূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকার মধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দির মধ্যে কে আছ"? কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না; কিন্তু অলঙ্কার-ঝঙ্কার শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা ও ঝটিকা প্রবেশ রোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন, এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, " যে কেহ মন্দির মধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে যদি পুরুষ হও তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও তবে নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাও, রাজপুত-হস্তে অসি চর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

সমাপ্তি।

ফুল কুটিল। অভিরামস্বামী গড় মন্দারণে গমন করিয়া মহা সমারোহের সহিত দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগৃহীতা করিলেন।

উৎসবাদির জন্য জগৎসিংহ নিজ সহচরবর্গকে জাহানাবাদ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তিলোত্তমার পিতৃবন্ধুও অনেক আহ্বান প্রাপ্ত হইয়া আনন্দকার্য্যে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

আয়েষার আগমনার্থে জগৎসিংহ তাঁহাকেও সম্বাদ করিয়াছিলেন। আয়েষা নিজ কিশোরবয়স্ক সহোদরকে সঙ্গে লইয়া এবং আর আর পৌরবর্গে বেষ্টিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

আয়েষা যবনী হইয়াও তিলোত্তমা আর জগৎসিংহের অধিক স্নেহবশতঃ সহচরীবর্গের সহিত দুর্গান্তঃপুরবাসিনী হইলেন। পাঠক মনে করিতে পারেন, যে আয়েষা তাপিতহৃদয়ে বিবাহের উৎসবে উৎসব করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। আয়েষা নিজ সহর্ষ চিত্তের প্রফুল্লতায় সকলকেই প্রফুল্লিত করিতে লাগিলেন, প্রস্ফুট কমল সরসীহৃদয়ের মন্দান্দোলন স্বরূপ সেই মৃদুমধুর হাসিতে সর্ব্বত্র শ্রীসম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বিবাহ কার্য্য নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। আয়েষা তখন সহচরগণ সহিত প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলেন; হাসিয়া বিমলার নিকট বিদায় লইলেন। বিমলা কিছুই জানেন না, হাসিয়া কহিলেন "সাহজাদি! আবার আপনার শুভকার্য্যে নিমন্ত্রিত হইব।"

বিমলার নিকট হইতে আসিয়া আয়েষা তিলোত্তমাকে ডাকিয়া এক নিভৃত কক্ষে আনিলেন। তিলোত্তমার কর ধারণ করিয়া কহিলেন,

"ভগিনি! আমি চলিলাম। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি তুমি অক্ষয় সুখে কাল যাপন কর।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার কত দিনে আপনার সাক্ষাৎ পাইব?"

আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাতের ভরসা কিরূপে করিব?"

তিলোত্তমা বিষণ্ণ হইলেন। উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাৎ হউক বা না হউক, তুমি আয়েষাকে ভুলিয়া যাইবে না?"

তিলোত্তমা হাসিয়া কহিলেন, আয়েষাকে ভুলিলে যুবরাজ আমার মুখ দেখিবেন না।"

আয়েষা গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন, "এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। তুমি আমার কথা কখন যুবরাজের নিকট উল্লেখ করিও না। একথা অঙ্গীকার কর।"

আয়েষা বুঝিয়াছিলেন যে জগৎসিংহের জন্য আয়েষা যে ইহ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এ কথা জগৎসিংহের হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিদ্ধ রহিয়াছে। আয়েষার প্রসঙ্গমাত্রও তাঁহার অনুতাপকর হইতে পারে।

তিলোত্তমা অঙ্গীকার করিলেন। আয়েষা কহিলেন, "অথচ বিস্মৃতও হইও না; স্মরণার্থ যে চিহ্ন দিই, তাহা ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া আয়েষা দাসীকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামত দাসী গজদন্তনির্ম্মিত-পাত্র-মধ্যস্থ রত্নালঙ্কার

আনিয়া দিল। আয়েষা দাসীকে বিদায় দিয়া সেই সকল অলঙ্কার. স্বহস্তে তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন।

তিলোত্তমা ধনাঢ্য ভূস্বামিকন্যা, তথাপি সে অলঙ্কার রাশির অদ্ভুত শিল্পরচনা এবং তন্মধ্যবর্ত্তী বহুমূল্য হীরকাদি রত্নরাজির অসাধারণ তীব্র দীপ্তি দেখিয়া চমৎকৃতা হইলেন। বস্তুতঃ আয়েষা পিতৃদত্ত নিজ অঙ্গভূষণরাশি নষ্ট করিয়া তিলোত্তমার জন্য অন্যজনদুর্লভ এই সকল রত্নভূষা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিলোত্তমা তত্তাবকের গৌরব করিতে লাগিলেন; আয়েষা কহিলেন,

"ভগিনি, এ সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণুর তুল্য নহে।" এই কথা বলিতে বলিতে আয়েষা কত ক্লেশে যে চক্ষের জল সম্বরণ করিলেন, তিলোত্তমা তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

অলঙ্কার সংনিবেশ সমাধা হইলে, আয়েষা তিলোত্তমার দুইটী হস্ত ধরিয়া তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ সরল প্রেমপ্রতিম মুখ দেখিয়া ত বোধ হয় প্রাণেশ্বর কখন মনঃপীড়া পাইবেন না। যদি বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা না হইল, তবে তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা, যে যেন ইহার দ্বারা তাঁহার চির সুখ সম্পাদন করেন।"

তিলোত্তমাকে কহিলেন,

"তিলোত্তমে! আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কাল-

হরণ করিব না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে দীর্ঘায়ুঃ করি-বেন। আমি যে এই রত্ন গুলিন দিলাম অঙ্গে পরিও আর আমার—তোমার সার রত্ন হৃদয় মধ্যে রাখিও।"

'তোমার সার রত্ন" বলিতে আয়েষার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিলোত্তমা দেখিলেন, আয়েষার নয়নপল্লব জল-ভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে।

তিলোত্তমা সমদুঃখিনীর ন্যায় কহিলেন, "কাঁদিতেছ কেন?" অমনি আয়েষার নয়নবারিস্রোতঃ দরদরিত হইয়া বহিতে লাগিল।

আয়েষা আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া দোলারোহণ করিলেন।

আয়েষা যখন আপন আবাস-গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখনও রাত্রি আছে। আয়েষা বেশ ত্যাগ করিয়া, শীতল-পবন পথ কক্ষ বাতায়নে দাঁড়াইলেন। নিজ পরি-ত্যক্ত বসনাধিক কোমল নীলবর্ণ গগনমণ্ডল মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারাদল জ্বলিতেছে; মৃদু পবন হিল্লোলে অন্ধকারস্থিত বৃক্ষ সকলের পত্র মুখরিত হইতেছে। দুর্গশিরে পেচক মৃদু-গম্ভীর নিনাদ করিতেছে। সম্মুখে দুর্গ প্রাকার-মূলে, যেখানে আয়েষা দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারই নীচে জলপরিপূর্ণ দুর্গপরিখা নীরবে আকাশ-পট-প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে মনে করিতেছিলেন,

"এই দুল পান করিয়া এখনই সকল তৃষা নিবারণ করিতে পারি।" আবার ভাবিতেছিলেন, "এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম তবে নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎ সিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?"

আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, "এ লোভ সম্বরণ করা রমণীর অসাধ্য; প্রলোভনকে দূর করাই ভাল।"

এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বঙ্গদর্শন।

একান্নবর্ত্তী পরিবার

যেমন জ্যোতিষ্ক সকল মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে, পৃথক অথচ সংযুক্তরূপে নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত বিভিন্ন হইলেও কোন অদ্ভুত কারণে আকৃষ্ট হইয়া একত্র সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অনেকেই সময়ে সময়ে মনে করে যে, "একাকী আসিয়াছি, একাকী মরিতে হইবেক," অতএব "পার্থিব সম্পর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর," পরন্তু এতাদৃশ বৈরাগ্যভাব কেবল ভাবুকদিগের কল্পনা মাত্র। যদ্যপি পার্থিবসম্পর্ক বৃথাই হয়, এবং মৃত্যু কর্ত্তৃক তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়া,

থাকিত, তবে বিয়োগ-দুঃখ এত অসহ্য এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কেন? মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী আদি নিকৃষ্ট জন্তু এবং নদী বৃক্ষ গৃহ পুষ্করিণী আদি নির্জীব পদার্থের উপরেও মায়া সংস্থাপিত হয়। বহু দিন হইল পিতৃমাতৃহীন হইয়াছি, তথাপি "মাতা এই স্থানে বসিয়া আমাকে আদর করিয়াছেন, পিতা এইখানে একবার ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং এই খানে বসিয়া তাঁহাদিগের অন্তিমকালে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি।" এই রূপ কথা মনে হইলে কত সময়ে চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। অতএব কি রূপে বলিব যে, তাঁহাদিগের সহিত এখন আর সম্পর্ক নাই। সংকুলপ্রসূত সন্তানই হউক, অথবা অতি দীন দুঃখী কিম্বা নিতান্ত দুর্জ্জন দুরাচারই হউক, কেহই মৃত্যুমাত্র সংসার হইতে সর্ব্বতোভাবে অপসারিত হইতে পারে না। দেহ পঞ্চত্ব পায়, জীবাত্মা কোথায় থাকেন তদ্বিষয়ে অনেকের মতি স্থির নাই, তথাপি কোন কোন জীবিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে যে কিছুকাল থাকিতে হইবেক, তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন না। এমন মনুষ্য নাই, যে কোন মৃত ব্যক্তিকেই স্মরণ করে না অথবা আপনি মরিলে স্মরণ করিবার লোক নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। এই অদ্ভুত মায়াজাল কেহই ত্যাগ করিতে পারে না, কাহারও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না— এবং পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমাদিগের বিবেচনায়—ইহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্যও নহে। অতএব ইহা হইতে যে প্রকারে সমাজের মঙ্গল হয়, সেই রূপ বিধান করাই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা ইহাকে ভাল মনে করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই বাক্য প্রযুক্ত

বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত এবং যাঁহারা ইহাকে মন্দ মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও অগত্যা ইহার আনুষঙ্গিক দোষ দূরীকরণ পূর্ব্বক লোকের হিত চেষ্টা করা নিতান্ত বিধেয়।

মনুষ্য জাতি যে পশুগণের ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ না করিয়া একত্র দল বাস করেন, তাহার আদি কারণ, বিবাহ সংস্কার। শুদ্ধ নিজের আহারাচ্ছাদন লোকের উদ্দেশ্য হইলে, অতি অল্প আয়াসেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু মনুষ্য পরের ভরণ পোষণ, এবং সন্ততিগণের ভাবি অবস্থা সকলের মনেই নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন কেহ অন্যান্য আত্মীয়দিগের মঙ্গল, এবং কেহ বা স্বদেশবাসিদিগের হিত অথবা সমগ্র মনুষ্য সম্প্রদায়ের শুভানুধ্যানে সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন. জনসমাজে বিবাহপ্রথা না থাকিলে ইহার কিছুই মনুষ্যের মনে উদয় হইত না। বিবাহ হইলেই স্ত্রীপুরুষের পূর্ব্বকালীন স্বাধীনভাব নির্ম্মূল হইয়া যায়, এবং উভয়ের মনেই আত্মচিন্তার পার্শ্বে পরচিন্তা আসিয়া আবির্ভূত হয়। তখন নিজের সম্বন্ধে যতই তাচ্ছিল্য থাকুক, পতিপত্নীর মঙ্গলকামনা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপ চিন্তা উপস্থিত না হইলে, কেহ কোন সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব পরিবারের ভরণ পোষণ নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া যে ব্যক্তি কোন কুকর্ম্ম করে, তাহার জন্য মহামায়াকে নিন্দা না করিয়া তাহার দারিদ্র্য নিবারণের উপায় চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত।

আবার বিবাহের পর সন্তান উৎপত্তি হইলে পতিপত্নীর মধ্যে নূতন একটী শৃঙ্খল নিবদ্ধ হয়। যে দেশে বিবাহপ্রথা

নাই, এবং স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই এতদ্বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী, সেখানে কেহ সন্তানলাভের সম্পূর্ণ সুখ অনুভব করিতে পারে না। জন্মদাতার সেই সন্তানে কোন অধিকার বর্ত্তে না, মাতাও তাহার জন্য আপনার ভিন্ন অন্যের প্রতি নির্ভর করেন না; সুতরাং সন্তান স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়রক্ষিকারী না হইয়া বরং বিচ্ছেদের হেতু হয়। বিবাহ সংস্কারকে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে চুক্তি বিশেষ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে বটে, কিন্তু সন্তানের সহিত সম্পর্ক কখনই সেরূপ বোধ হয় না; অতএব ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই নিগূঢ় মর্ম্মবোধ হইবেক। মহাভারতে লিখিত আছে যে, শ্বেতকেতু পিতৃ সমক্ষে আপন মাতাকে কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত গমন করিতে দেখিয়া, এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, স্ত্রীজাতি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সেবা করিতে পারিবেন না। এই গল্পটী বিবাহ প্রথা সংস্থাপনের রূপকমাত্র। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, পুত্রই মাতার স্বেচ্ছাচার নিবারণ করেন এবং পিতাকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া রাখেন। অতএব পতি পত্নী সম্বন্ধ শিথিল করা কর্ত্তব্য নহে, বরং যত প্রগাঢ় হয়, ততই উভয় এবং পুত্রের পক্ষে মঙ্গল। আর এই মঙ্গলে সমস্ত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেরই মঙ্গল।

পতি পত্নীর চিরকাল একত্র থাকাই শ্রেয়। এ কথা স্বীকার করিলেও আর একটী পৃথক মীমাংসার প্রয়োজন হইতেছে যে, পুত্র কন্যারাও পিতৃসংসারে মাতার সহ সংযুক্ত থাকিবেন কি না? কিন্তু যখন (নানাবিধ বিশিষ্ট

আমাদিগের মহিলারা সকলের সঙ্গে কথা কহিতে ও ইচ্ছামত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন না।

একান্নে থাকিলে সকলেই সুখদুঃখে বা ঘটনা বিশেষে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন। ইহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও কার্য্যগতিকে এক জনের দ্বারা অন্যের হিতসাধন হয়, এবং তাহা হইতে কখন কখন কার্য্য কারণের বিপর্য্যয় ঘটিয়া—স্নেহ হইতে যত্নের পরিবর্ত্তে, অগত্যা যত্ন করিতে করিতে—লোকের মনে প্রকৃত ভক্তি, স্নেহ ও দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে। পিতা মাতার ত কথাই নাই, একান্নবর্ত্তী পরিবারে অন্যের প্রতিও কখন কখন এতাদৃশ মমতা জন্মে যে, পৃথগন্নে থাকিলে মনোমধ্যে তাহার উদয় হইতেই পারে না। এতদ্ভিন্ন, তৃণ নির্ম্মিত রজ্জুর ন্যায়, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বল তুল্য সংখ্যক পৃথক সংসারের সমষ্টি অপেক্ষা অধিকতর হইবার সম্ভাবনা, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনেকগুলি দোষও স্পষ্ট দেখা যায়। বহুপরিবারের অভিভাবকেরা কেহই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না। একান্নবর্ত্তী পরিবারদিগের পরস্পরের প্রতি মায়া যেমন বৃদ্ধি, তেমনি হ্রাস হইবার সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃত অধিক। পিতা মাতার প্রতি পুত্রের ভক্তি সহজে বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য পরিবারের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না হইয়া বরং অসাধারণ বৈরিতা এবং ভয়ানক জ্ঞাতি-বিরোধ জন্মে। পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে কনিষ্ঠেরা পিতৃতুল্য মান্য করিতেন, সুতরাং সকল কার্য্যেই পরস্পরের

মধ্যে আত্মপ্রীতি, এবং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের লক্ষণ দৃষ্ট হইত, এবং কোন বিষয়ে কাহারও মনে দ্বিধা উপস্থিত হইত না। কিন্তু এক্ষণে সকল লোকের ইচ্ছাগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা একাদৃশ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে [illegible] কর্ত্তারা আর মতেই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মতের [illegible] উচিত অথবা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। অধিকন্তু কনিষ্ঠেরা তাহা প্রকাশ করিলে জ্যেষ্ঠের মনে বিরক্তি জন্মে। পূর্ব্বে স্ত্রীকে তাড়িত না করাই স্বামীর সচ্চরিত্রতার লক্ষণ ছিল; এক্ষণে পতি পত্নীর প্রেম দেখিলে লোকেই দোষ দিতে পারেন না; আর এক্ষণে প্রণয় হইতে যে সকল [illegible] উদ্ভাবিত হয় তাহা [illegible] পরিবারে [illegible] [illegible] পুত্র কি কাহার সহোদর [illegible] প্রবীণ সম্ভ্রান্ত [illegible] করিলে, গৃহস্বামী কিঞ্চিৎ অসুখী হয়েন। ইহা [illegible] পক্ষে উচিত ব্যবহার নহে।

এক একবর্ত্তী পরিবারের ভ্রাতাদিগের মধ্যে বয়োধিক্য মতে প্রাধান্য জন্মে কিন্তু সন্তানগণের পক্ষে পিতাই কর্ত্তা গৃহস্বামী কনিষ্ঠদিগের সেই কর্তৃত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইহাতে একটি গুরুতর হানি হয়। বালক বালিকারা একজনের দ্বারা শাসিত হইলে অন্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে, সুতরাং এক দিকে পিতা, অন্য দিকে গৃহস্বামী আংশিক রূপে তাহাদিগের অভিভাবক হওয়াতে উভয়ের কেহই আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন না, এবং উহারাও শাসক হীনের ন্যায় আচরণ করে।

পূর্ব্বকালে বধূগণ কেবল গৃহস্বামিকেই সর্ব্বাধ্যক্ষ বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে দাম্পত্য প্রণয়ের আধিক্য বশতঃ তাঁহারাও পতি এবং শ্বশুর অথবা ভাসুর, দুইজন কর্ত্তার অধীন হইয়া অনেক স্থলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবহার করেন।

ভ্রাতৃস্নেহ অতি অমূল্য পদার্থ; কিন্তু একবার ভ্রাতার যত্ন নাই বলিয়া সন্দেহ হইলে সে ক্ষোভ কদাচ নিবৃত্ত হয় না। অপর ব্যক্তি মৌখিক স্নেহ প্রকাশ করিলেও সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু আত্মীয়গণের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইলেই অসহ্য বোধ হয়। ফলতঃ মনুষ্যের মনে একটী প্রবৃত্তি বলপ্রাপ্ত হইলে অন্য গুলি সহজেই খর্ব্ব হইয়া যায়; পতি পত্নীর মধ্যে প্রগাঢ় স্নেহ এবং গুরু জনের প্রতি অবিচলিত ভক্তি, উভয় রক্ষা করা অসাধ্য। অতএব একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিশৃঙ্খলা স্বাভাবিক বলিতে হইবেক।

বিলম্ব হয় এবং যাহা অন্যের মৃত্যুর দরুন (অর্থাৎ উত্তরাধিকারী হওয়া) পাওয়া যায় তাহা একেবারে আসিয়া পড়ে, অথবা যখন প্রতারণা উৎপীড়ন ও অন্যান্য অন্যায় উপায় দ্বারা ধন আইসে তখন উহা যেন দৌড়িয়াই আইসে।

ধনী হওয়ার অনেক পথ আছে, কিন্তু তাহার অধিকই দোষপূর্ণ। কৃপণতা একটী উৎকৃষ্ট উপায় বটে, কিন্তু দোষশূন্য নহে। ইহাতে লোককে উদারাশয় ও বদান্য হইতে দেয় না। ভূমির উর্ব্বরতা দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা অতি উৎকৃষ্ট। ইহা লোকমাতা বসুন্ধরার প্রসাদ স্বরূপ; কিন্তু উহা বহু কালসাধ্য। ধনী লোকে কৃষি আরম্ভ করিলে অতি অল্পকালমধ্যেই বিপুল অর্থাগম হয়। আমি ইংলণ্ডের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জানিতাম; আমাদের সময়ে তাঁহার মত রোজগার ছিল এত আর কাহারও ছিল না। তিনি এক জন প্রধান পশুপালক, প্রধান মেষরক্ষক এবং প্রধান কাষ্ঠব্যবসায়ী ছিলেন। পাথরিয়া কয়লা, ভুসী জিনিস, সীসা, লৌহ প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর কারবারেও অতিশয় ক্ষমতা ছিল; সুতরাং নিরন্তর আমদানীর পক্ষে পৃথিবী তাঁহার নিকট সমুদ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

এক জন বলিয়াছেন "তিনি অতিকষ্টে অল্পমাত্র ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।" কারণ যখন মানুষের মূলধন এরূপ হইয়া উঠে যে বাজারের সুবিধার অপেক্ষা করিতে পারে এবং অন্যের যাহা পুঁজির বাহির এরূপ সওদাও করিতে পারে, অথচ খুচরা ব্যাপারীদিগের পরিশ্রমের অংশভাগী হয়, তখন সে অবশ্যই অতুল ধনশালী হইবে সন্দেহ নাই।

সাধারণ বাণিজ্যে অতি সৎ উপায়েই উপার্জ্জন হয়। পরিশ্রম ও সুখ্যাতি দ্বারা তাহার উন্নতিও হইয়া থাকে। কিন্তু চুক্তির কারবারে যাহা লাভ হয় তাহা সর্ব্বাংশে সৎ নহে উহাতে অন্যের দরকারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, চাকরদের নিকট ঘুসও লওয়া হয় এবং চাতুরী করিয়া অন্য খরিদ্দারকেও তাড়াইতে হয়। এরূপ কার্য্যে ধূর্ত্ততার বিশেষ সংস্রব আছে।

সওদা বদল সম্বন্ধে—যখন কোন ব্যক্তি কেবল বিক্রয়ের জন্য জিনিস খরিদ করে, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই স্বার্থ রক্ষা করিতে হয়, এখানে কারবারে বিস্তর মুনফা হয়, কিন্তু যাহাদের উপর ভার থাকে তাহাদের বিশ্বাসী হওয়া চাই।

সুদের কারবারে নিষ্কণ্টকে লাভ হয়, কিন্তু উহা অতিশয় কুৎসিত ব্যবসায়। সুদখোর অন্যের পরিশ্রম দ্বারা আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে; অমাবস্যাতেও উহার লাঙ্গল কামাই হয় না, যদিও ইহা লাভের নিষ্কণ্টক পথ বটে, কিন্তু ইহার কতকগুলি দোষও আছে। সময়ে সময়ে দালালেরা আপন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দেউলেপড়া খাতককেও আনিয়া দেয়। যাহার অদৃষ্টে নূতন উদ্ভাবন বা বিশেষ স্বত্ব জুটে সময়ে সময়ে তাহার যথেষ্ট অর্থাগম ও হয়। কানারি দ্বীপে যে প্রথম ইক্ষুর চাষ করিয়াছিল তাহার অদৃষ্টেও ঐ রূপ ঘটিয়াছিল, অতএব যাহার উদ্ভাবনীশক্তি আছে এবং বিবেচনার অপ্রতুল নাই সেই যথার্থ তার্কিক। সময় বুঝিয়া চলিতে পারিলে সে গুরুতর কার্য্যও সাধন করিতে পারে।

যে নিশ্চিত লাভের উপর নির্ভর করে সে কখন বড় মানুষ হইতে পারে না, এবং যে সর্ব্বস্ব কারবারে খাটায় সে লোকটি [illegible] ও দরিদ্র হইতে [illegible] নির্ভর [illegible] [illegible] [illegible]

একচেটিয়া ও একেবারে বাজারের সমুদায় জিনিস খরিদ করা (যেখানে উহা আইন বিরুদ্ধ নয়), ধনী হইবার প্রধান উপায়। বিশেষতঃ লোকের কি অত্যন্ত দরকার যদি তাহা জানিতে পারা যায়, ও সেই সেই জিনিস সর্ব্বাগ্রে খরিদ করিয়া একচেটিয়া করিয়া রাখা যায় তাহা হইলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। চাকরী দ্বারা উপার্জ্জন যদিও উন্নতি হইতে পারে বটে, কিন্তু খোসামুদি, মনযোগান কিম্বা অন্যান্য কুৎসিত কার্য্য দ্বারা যদি চাকরী লইতে হয় তবে উহা হইতে নীচ কাজ আর নাই। খোসামুদি করিয়া কাহারও উত্তরাধিকার পত্রে নাম লেখান বা ভুক্তি সংরক্ষক হওয়ার বিষয় সেনেকার সম্বন্ধে উত্তম বলিয়াছিলেন। "সেনেকা উত্তরাধিকার পত্র ও ওয়াওডি যেন জাল ফেলিয়া ধরিতেন।" ইহা সকলের অধম; ইহাতে চাকরী অপেক্ষা নীচ লোকের সেবা করিতে হয়।

যাহারা ধনকে ঘৃণা করে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না, কারণ যাহারা ধনোপার্জ্জনে নিরাশ হইয়াছে তাহারাই ধনকে ঘৃণা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা যখন ধনী হয় তখন তাহাদের মত অর্থপিশাচ হইতে আর কাহাকেও দেখা যায় না।

তোমার যেন সিকি পয়সাও ব্যয় হয় না। ধনের পাখা আছে, উহা কখন কখন আপনা আপনি উড়িয়া যায়, কখন বা অধিক ধনের আশায় উড়াইয়া দিতে হয়।

কেহ কেহ আপন আত্মীয়গণকে ধন দিয়া যান, কেহ বা সাধারণের উপকারার্থে দিয়া থাকেন কিন্তু দুই দিকে পাত্রো-চিতরূপ দান করাই ভাল। যখন কোন ব্যক্তি বিপুল সম্প-ত্তির অধিকারী হয় তখন যদি তাহার বয়স ও বিবেচনার পরিপাক না হইয়া থাকে তাহা হইলে অনেক অর্থলোলুপ গৃধ্র আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলে।

অনাথবাস, অতিথিশালা প্রভৃতি যদি কেবল জাঁকজম-কের জন্য স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উহা কেবল ভক্তিহীন পূজা মাত্র অথবা বহিঃশোভিত শবাধার বলিলেও বলা যায়; উহার ভিতর পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে। অতএব পরিমাণ ধরিয়া তোমার দানশীলতার মাপ করিও না, উহা কতদূর কার্য্যোপযোগী হইল তাহা ধরিয়া মাপিয়া লও। মৃত্যুকালে দান করিব বলিয়া স্থির হইও না। যদি ভাল করিয়া বিবেচনা কর তবে এরূপ করা কেবল অন্যের ধনে নবাবী মাত্র, নিজের ধনে নহে।

মানুষের স্বভাব।

লোকে প্রায়ই আপন স্বভাব গোপন করে; কখন কখন দমন করিয়াও রাখে; উহা কদাচিৎ একেবারে বিলুপ্ত হয়। বল প্রকাশ করিলে উহা ভয়ানক হইয়া উঠে, উপদেশ ও

কথোপকথনে অনেক শান্ত হয় এবং কেবল অভ্যাস দ্বারাই পরিবর্ত্তিত ও বশীভূত হইতে পারে।

যিনি আপন স্বভাব জয় করিতে চান তিনি যেন একেবারেই তাহা রুদ্ধ বা পরিবর্ত্তন না করেন, কারণ প্রথম পক্ষে যদি তিনি কৃতকার্য্য না হইতে পারেন তবে একেবারে দমিয়া যাইবেন। দ্বিতীয় পক্ষে যদিও তিনি কৃতকার্য্য হয়েন কিন্তু মন্থরগতি হইতে হইবে। অতএব প্রথম সাঁতার শিখিতে হইলে যেরূপ সোলার ভাড়ী বা বাতাসপোরা ভিস্তি লইতে হয় সেইরূপ প্রথমে তাঁহাকেও কিছু কিছু সাহায্য লইতে হইবে। কিছু দিন পরে, যেরূপ নর্ত্তকেরা মোটা জুতা পরিয়া নাচ শিখে সেরূপ তাঁহাকেও কিছু অসুবিধা স্বীকার করিয়া স্বভাব বশীকরণ অভ্যাস করিতে হইবে; কারণ সচরাচর কাজের জন্য যত দূর দরকার, অভ্যাস যদি তাহা অপেক্ষা কঠিনতর হয়, তাহা হইলে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে। যেখানে স্বভাব অতিশয় দুর্দ্দান্ত, সুতরাং তাহা জয় করাও কঠিন ব্যাপার, সেখানে ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করা অত্যন্ত আবশ্যক। যেমন কেহ কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে মাতৃকাক্ষর পাঠ করিয়া ক্রোধ সংবরণ করে সেইরূপ প্রথমে অবসর বুঝিয়া স্বভাবকে থামাও; তদনন্তর যেমন সুরাপান ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে ভৈরবীচক্র ত্যাগ করিতে হয় ও আহারের সময়ই কেবল যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহারমাত্র থাকে এবং শেষে অনায়াসে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, সেইরূপ স্বভাব দমন করিতে হইলেও ক্রমে ক্রমে বশীকরণের পরিমাণ বাড়াইয়া দাও। কিন্তু যাহার এরূপ সহিষ্ণুতা ও স্বভা-

বলায় আছে যে একেবারেই আপনাকে স্ববশে আনিতে পারে তাহা একেবারেই স্বাধীন হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

"যে দুঃখ অন্তঃ খুলিয়া খায় তাহা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেওয়া ভাল; তাহা হইলে একটী প্রবল কষ্ট ভোগ করিয়াই যাবজ্জীবন একটা যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারা যায়।"

"যেরূপ একটি বাঁকা ছড়িকে সোজা করিতে হইলে বিপরীত দিকে নোয়াইতে হয় সেইরূপ যেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিলে কোন দোষস্পর্শ হয় না, সেস্থলে স্বভাবকে সৎপথে আনিবার জন্য বিপরীত দিকে লইয়া যাওয়া ভাল।" এই প্রাচীন নিয়মটী বড় অসঙ্গত নহে। নিরন্তর অনুশীলন দ্বারা কোন একটী সংস্কার বদ্ধমূল করিও না; মধ্যে মধ্যে উহার বিরাম রাখিও; তাহা হইলে আরও সবল হইয়া অগ্রসর হইতে পারিবে।

মানুষ সর্ব্বগুণান্বিত নহে। উহার কোন না কোন একটা দোষ আছেই আছে; সুতরাং যদি সে নিরন্তর কোন প্রকার স্বভাব অভ্যাস করে, তবে তাহার গুণও যেরূপ অভ্যাস পাইতে পারে দোষও সেইরূপ বদ্ধমূল হইবার সম্ভাবনা। অতএব সময় বুঝিয়া বিরাম দেওয়া ব্যতীত ইহা হইতে পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

কেহ যেন তাহার স্বভাবকে একেবারে জয় করিয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করে না। স্বভাব স্তম্ভিত হইয়াও অনেক দিন থাকিতে পারে এবং সময় পাইয়া বা কোন প্রয়োজন

দেখিয়া পুনরায় উদ্রেকিত হয়। এ বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ ঈসপের একটী গল্প আছে, যথা 'কোন ব্যক্তি একটী বিড়ালকে পরমসুন্দরী যুবতী করিয়াছিল, তথাপি ঐ যুবতী, যে পর্য্যন্ত একটী ইন্দুর সম্মুখ দিয়া না যাইত সে পর্য্যন্ত টেবিলের এক ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত" অতএব প্রলোভনের সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ করা ভাল, অথবা বারম্বার উহার সম্মুখে দাঁড়াও তাহাতে চঞ্চল হইবার অত্যল্প সম্ভাবনা থাকিবে।

নির্জ্জনে মানুষের স্বভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পায়; কারণ সেখানে আন্তরিক ভাব ঢাকা থাকে না, কোপ সময়ে লোকে আপন শাসনের বাহিরে থাকে; তখন সে নূতন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং পরিচিত অভ্যাসের ফল আর কিছুই খাটে না.

যাহাদের ব্যবসায় স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ তাহারাই সুখী, অন্যথা তাহারা যে বিষয় ভাল বাসে না তাহার চর্চ্চা-কালে বলিতে পারে, আমাদের আত্মা অনেক দিন বিদেশী হইয়াছে। শাস্ত্রচর্চ্চাবিষয়ে যে সকল পুস্তক না পড়িলে নয় বলিয়া পড়িতে হয়, তাহার জন্য সময় নিরূপণ করা ভাল; আর যাহা ভাল লাগে তজ্জন্য সময় নির্দ্ধারণের প্রয়োজন নাই; তাহার মন সে দিকে আপনা হইতেই দৌড়িবে; অন্যান্য কার্য্যের সময় নির্দ্ধারণ করিলেই যথেষ্ট হইল।

মানুষের স্বভাব হয় শস্যপূর্ণ হইবে, নয় নিবিড়তৃণাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। অতএব সময়মত শস্যে জলসেক কর এবং ঘাস উঠাইয়া দাও।

———

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

পৌল ও ভর্জ্জিনী।

উপসংহার।

সুতরাং কাল কি বলিব বৎস! মৃত্যু মানবগণের পক্ষেই পরম প্রার্থনীয় শুভকর্ম্ম। জীবন যেন একটি ক্লেশকর দিন, মৃত্যু তাহার রজনীস্বরূপ। রোগ, শোক, পরিতাপ, বিপত্তি ও ভয় এবং আর যাহা কিছু মনুষ্যদিগকে নিরন্তর বিলোড়িত করে, সে সমুদায় মৃত্যুরূপ সুষুপ্তিতে বিলীন হইয়া যায়। যাহাদিগকে বড় সুখী মনে কর, তাহাদিগেরই পরীক্ষা কর, দেখিবে তাহাদিগের অল্প সুখ ক্রয় করিতে অনেক দাম লাগিয়াছে। তাহারা গার্হস্থ্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া যশের মুখ দেখিতে পায়, স্বাস্থ্য বলিদান দিয়া ধন-সঞ্চয় করে এবং অজস্র স্বার্থ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরের প্রণয় ও তজ্জনিত দুর্লভ সুখ লাভ করে। অনেকে পরার্থসাধনে আয়ুঃ শেষ করিয়াও শেষ দশায় কপটী বান্ধব আর কৃতঘ্ন স্বজন ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না। কিন্তু ভর্জ্জিনী চরম ক্ষণ পর্য্যন্ত সুখেই কাটাইয়াছে। যাবৎ আমাদের নিকটে ছিল, তাবৎ প্রকৃতির বদান্যতা থাকাতে তাহাকে কোন অপ্রতুল দেখিতে হয় নাই। আর যখন আমাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইল তখনও কি সে একেবারে সকল সুখহারা হইল কখনই নহে। তাহার সদৃশ সাধুতা থাকিলে কোন অবস্থাতেই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভাগী হইতে হয় না। তাহার ধর্ম্ম ও সদ্গুণসমূহ তাহার পক্ষে অক্ষয় সুখের ভাণ্ডারস্বরূপ

ছিল। [illegible] মৃত্যুকালেও [illegible] সুখের পরিসীমা ছিল না। [illegible] তাঁহার নিমিত্ত রোদন [illegible] দেশশুদ্ধ লোকের প্রাণ [illegible] করুক, চাই তাঁহার [illegible] নিমিত্ত [illegible] সংসাহস [illegible] প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করুক, সে চারি দিকেই দেখিয়াছে যে সকলে তাহাকে কত ভাল বাসে। তাঁহার জীবন যেরূপ পরিশুদ্ধ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে তাহাতে কখনই পারত্রিক [illegible] তাঁহার মনে স্থানলাভ করে নাই। বিধাতা ম্রিয়মাণ সাধুজনের হৃদয়কে সুস্থির করিবার নিমিত্ত যে অবিচলিত সাহস [illegible] প্রদান করেন সেই সাহসে ভর করিয়া বিপদের প্রতি সে দৃকপাতও করে নাই। সে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তির [illegible] বিকারশূন্য [illegible] প্রদর্শন করিয়াছে।

সংসারে যে সকল অতি গুরু বিপত্তি আছে, সাধু জনদিগকেও যে তাহা সহ্য করিতে হয়, ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। বিপদ উপস্থিত হইলে কিরূপ ভাব ধরিতে হয়, কিরূপ মাহাত্ম্য দেখাইতে হয়, তাহা সাধুজনেরাই জানেন। তাঁহারাই দুর্দৈবের তর্জনাতে ভয় পান না, বরং উহা ধিক্কার পূর্ব্বক অতুল কীর্ত্তি লাভ করেন, অনুপম ধীরতার দৃষ্টান্ত দেখান। এই উদ্দেশেই পরমেশ্বর সাধুদিগের উপর বিপদের সুব্যবহার করিবার ভার অর্পণ করেন, কারণ তাঁহারাই বিপদের সুব্যবহার করিতে সমর্থ। যখন অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তিমণ্ডলে সাধুজনকে মণ্ডিত করিতে বিধাতার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সাধুজনকে সংসাররূপ উদাত্ত নাট্য মন্দিরে দণ্ডায়মান করিয়া বিবিধ কষ্ট ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করান,

পুরস্কৃত করিবেন না? তোমার কি মনে হয় যে, যে অচিন্ত্য-কৌশলে মনুষ্য উচ্চাশয় মনকে তেমন প্রিয়দর্শি শরীর রূপ পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিয়াছিল, যে শক্তি সেই শরীরে অস্থি সংস্কার দিবা নির্মাণের সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া দিয়াছিল, সেই শক্তি তাহার হইতে জড়জীবীকে তুলিবে না? যিনি আমাদের অপরিচ্ছেদ্য নিয়মাবলী দ্বারা ইহকালে মানববর্গের সুখের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ অপরিচ্ছেদ্য অন্তর্নিহিত নিয়মাবলী দ্বারা পরকালে অন্যপ্রকার সুখ দিতে কি অসমর্থ? সত্য বটে, পারত্রিক সুখের বিষয়ে আমরা কিছুই অবধারণ করিতে পারি না, পরকাল যে কিপ্রকার তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না, কিন্তু তা বলিয়া কি পরকাল নাই বলা যায়? যখন ভূমিষ্ঠ হইলাম তখন কি এই পৃথিবীর স্বরূপ চিন্তা করিতে পারিয়াছিলাম, তখন কি সংসারের ভাব কিছুমাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলাম? যাহা কিছু আমাদের বুদ্ধির অগম্য ও চিন্তাশক্তির অগোচর তাহাই অলীক ও অবাস্তবিক ইহা কি ন্যায়ের কথা? আমরা এখন যে অন্ধকারময় জড়ধর্মী অবস্থায় বর্তমান আছি তথা হইতে পরকালের ভাব কি রূপে কল্পনা করিব? ইহা কি সম্ভব যে পরমেশ্বর ভূমণ্ডল ব্যতীত আর কুত্রাপি আপন করুণা ও ও জ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই? যে বিশাল অবকাশ মৃত্যুর ছায়াতে আচ্ছন্ন আছে তন্মধ্যে কি তিনি মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিতে পারেন না? সমুদ্রের প্রত্যেক জলবিন্দুতে অসংখ্য সূক্ষ্মশরীর প্রাণী বাস করে, তবে উপরে পরিবর্তমান অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি একেবারে শূন্য হইয়া আছে ইহা

বিশ্বাস করা যায় কি? কেবল আমাদের নিবাসভূমি পৃথিবী ব্যতীত আর কোথাও অচিন্ত্য শক্তি ও অপার জ্ঞানের কি প্রকাশ নাই? ঐ সকল উজ্জ্বল অসংখ্য মণ্ডলসমূহ, নীহারিকা, যা মহানিশায় অগম্য ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় স্থানসমূহ কি কেবল অনর্থক নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মরুভূমি হইয়া আছে? যদি ঈশ্বরের শক্তির সীমা থাকিত, যদি শত শত প্রমাণ দ্বারা তাঁহার ক্ষমতা অসীম বলিয়া প্রতিপন্ন না হইত, তবে বলিতে পারিতাম বটে যে এই যে পৃথিবী দেখিতেছ যথায় ধর্ম্ম ও পাপের যুদ্ধ হইতেছে, যথায় জীবন ও মরণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেই পৃথিবীই ঈশ্বরের রাজত্বের সীমাভূমি।

নিঃসংশয়ই এমন স্থান আছে, যথায় ধর্ম্মের পুরস্কার হয় এবং সাধুগণের পরম সুখ লাভ হয়। আহা, যদি সেই দিব্যলোক হইতে ভর্জিনী তোমার সহিত কথা কহিতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্যই এই ভাবে সম্ভাষণ করিত। "পৌল হে! জীবন কেবল পরীক্ষামাত্র, পৃথিবী কেবল পরীক্ষার স্থলমাত্র। যত দিন সেই পরীক্ষাস্থলে ছিলাম, তত দিন আমি ধর্ম্মের কোন সেতু ভঙ্গ করি নাই, প্রকৃতির উপদিষ্ট কোন আচার পরিত্যাগ করি নাই, এবং ধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কোন পথ উল্লঙ্ঘন করি নাই। আমি মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থ সমুদ্র পার হইয়াছি, আমি ঐশ্বর্য্য পরি- ত্যাগ করিয়া চারিত্র রক্ষা করিয়াছি, আমি কৌমারব্রত ভঙ্গ অপেক্ষা প্রাণনাশ করিয়াছি। বিধাতা দেখিলেন যে আমার জীবন যাত্রাতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইল, অতএব দয়া বৃষ্টি করিয়া ক্লেশময় জীবন যাত্রা সাঙ্গ করিয়া

তাহার মর্ম্ম কঠিন, বুঝিতে পারিতেছি না! অতিপ্রাকৃত শক্তি পরম করুণাময়ের দুঃখশান্তির নিমিত্ত যাহা কিছু শক্তি করিতে পারিয়াছেন, আমার সে অনুদান ভোগ হইতেছে! আমারই মত দুঃখভোগী অসংখ্য লোকের সহিত মিলিত হইলে যত সন্তোষ লাভ হয়, তাহা আমার লাভ হইতেছে! অতএব হে বৎস! তোমার পরীক্ষার যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা ধৈর্য্যচিত্তে সহ্য কর. তাহা হইলেই এক অক্ষয় অবিনাশী প্রীতি দ্বারা তোমার প্রিয়তমা ভর্জ্জীনীর সুখ অনন্তগুণ করিতে পারিবে! তখন আমি তোমার সকল দুঃখ শান্ত করিয়া দিব, সমুদয় বাষ্পজল পুঁছাইয়া দিব! হে মিত্র! হে প্রিয়তম বর! তোমার মনকে সেই নিত্য দশার আশাতে উন্নত করিয়া বর্ত্তমান কালের ক্ষণিক যন্ত্রণা সহ্য কর।'

আপন আন্তরিক ভাবভরে আমার কণ্ঠরোধ হইল। পৌল এক দৃষ্টিতে কতক্ষণ আমার প্রতি চাহিয়া কহিল 'সে আর নাই! হায় সে আর নাই!' এই হৃদয়বেদনদায়ী কথার পরই সুদীর্ঘ মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। চেতনা হইলে বলিল 'আচ্ছা' তবে ত মরণ এক প্রকার শুভ বলিতে হইবে। তবে আমিও যত শীঘ্র পারি মরিয়া ভর্জ্জীনীর কাছে যাইব।' এই রূপে আমার সান্ত্বনাচেষ্টা বিপরীত ফলে পরিণত হইল এবং তাঁহার নৈরাশ্য কেবল বাড়িতে লাগিল। যেমন বন্ধুকে নদীতে নিমগ্ন হইতে দেখিলে তাঁহার সুহৃৎ সাঁতার জানেন না, অথচ উদ্ধার করিতে গিয়া বন্ধুকে আরও বিপদে ফেলেন, আমিও তদ্রূপ হইলাম। হায়! পৌল

ছেলেমেয়েরা, কখন দুর্দ্দশা ভোগ করে নাই, লোকে পাঁচবার [illegible] বড় বড় দুঃখ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পৌলের পরিবারের সর্ব্বনাশ ঘটিল।

অনন্তর তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। তখন বিবি দিলাতুর এবং পৌলের জননী অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ মার্গারেট স্বভাবতঃ প্রফুল্লস্বভাব ছিলেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে বড় শক্ত আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। বাস্তবিকও আমোদী লোকে ক্ষুদ্র দুঃখ অনায়াসে সহন করে বটে, কিন্তু নিদারুণ দুর্দশাতে একেবারে অবসন্ন হয়। তিনি আমাকে কহিলেন 'মহাশয় গো! কালী রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে ভর্জ্জীনী শুভ্র বসন পরিধান পূর্ব্বক পরম রমণীয় একটি উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাকে কহিল 'আমি যে সুখ ভোগ করিতেছি, তাহা সকলের প্রার্থনীয়।' পরে স্মিতমুখে পৌলের কাছে গিয়া তাহাকে আকাশে তুলিয়া লইল। আমি আপন পুত্রকে ধরিব এই চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাদের সঙ্গেই উঠিতে লাগিলাম। তখন যেন অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব হইল। সখীকে সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত মুখ ফিরাইয়া দেখি যে, তিনি দমিঙ্গ ও মেরীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সখীও কালি রাত্রে ঠিক এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। আমি কহিলাম ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই ঘটে না। আর, স্বপ্নের কথাও অনেক স্থলে ফলিয়া যায়।'

বিবি দিলাতুরও আমাকে সেইরূপ স্বপ্নের বিবরণ বলিলেন। এই দুই মহিলা কিছুমাত্র কল্পনাপরতন্ত্র ছিলেন না,

তাঁহাদিগের কোন কুসংস্কারে শ্রদ্ধা ছিল না. অতএব উক্ত-
যের স্বপ্নবৃত্তান্ত দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ
হইল। মনে মনে এও প্রতীতি হইল যে, স্বপ্নের কথা শীঘ্রই
ফলিবে। স্বপ্ন যে অনেক স্থলে সত্য হয় এ প্রত্যয় সর্ব্ব
জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে মহান্ মহান্
পুরুষেরা এ প্রত্যয়ে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা যে কাল্পনিক
অহঙ্কার পরবশ ছিলেন ইহা কে বিশ্বাস করিবে? বাইবেলেও
অনেক স্বপ্ন সত্য হইবার বৃত্তান্ত আছে। আমি নিজেও
অনেক স্থলে ভাবী ঘটনা স্বপ্ন দ্বারা প্রকাশিত হইতে দেখি-
য়াছি। আর যতই কেন বিচার কর না, এ সকল বিষয়
নিতান্ত দুরূহ ও দুর্ব্বোধ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে
হইবে। ফলে, যদি আমাদের বুদ্ধি পরম পুরুষের বুদ্ধির ক্ষুদ্র
প্রতিবিম্ব স্বরূপ হয় তবে বিশ্বনিয়ন্তা কি স্বপ্নরূপে আমাদের
বুদ্ধিতে কখন কিছু উদ্বোধ করিতে পারেন না? কত সমুদ্র
পার হইয়া কত সংগ্রামপ্রবৃত্ত দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক কোন
ব্যক্তির হস্তলিপি তাঁহার বন্ধুর করে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-
সঞ্চার করে ইহা নিত্য দেখিতে পাই। তবে যিনি ধর্ম্মের
একমাত্র শরণ্য, তিনি কি ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তদিগের চিত্তখেদ
নিবারণের নিমিত্ত কোন বিষয় কি জানাইতে পারেন না?
অন্তর্যামী অন্তরেই ভাবোদয় করিয়া সুমতি প্রদান করেন,
তবে ভবিষ্যৎ বিষয় বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত বাহ্য উপায় অবল-
ম্বন না করিলে কি তাঁহার চলে না? আর স্বপ্নের কথা এত
অলীক মনে করিবার বিষয়ই বা কি? সুখদুঃখাদিব্যাপার
পূর্ণ সংসার স্বপ্ন নয় ত আর কি?

সে যাহা হউক, সখীদিগের স্বপ্ন ফলিতে বড় বিলম্ব হইল না। দুই মাস পরে পৌলের মৃত্যু হইল, তখন পর্য্যন্ত তাহার মুখে ভর্জ্জিনীর নাম। তাহার জননী ইহার আট দিন পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। অন্তকালে ধার্ম্মিক ব্যক্তির যেরূপ আহ্লাদ হয়, তাঁহারও সেইরূপ দেখা গেল। মৃত্যুশয্যায় তিনি দিলাতুরের নিকট বারম্বার সস্নেহে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন 'সখি, এই বার যে দেখা হইবে তাহাতে আর বিচ্ছেদ নাই। আহা মৃত্যু কি প্রার্থনীয় বস্তু! ইহার মত শুভ আর নাই। জীবন কেবল যন্ত্রণাভোগ মাত্র, ইহা শেষ হইলেই ভাল। যখন পরীক্ষা দিবার নিমিত্তই পৃথিবীতলে আসা, তখন পরীক্ষা যত সংক্ষেপ হয়, ততই সুখের কথা।' দমিঙ্গ ও মেরী কর্ম্মের বাহির হইয়া গিয়াছিল, দয়ালু গবর্ণর রাজকোষ হইতে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন বিধান করিলেন আর বেচারা গৃহকুক্কুরটী পৌলের মৃত্যুর পরেই শোকে মরিয়া গেল।

রামগতি ন্যায়রত্ন।

৺রামমোহনরায়ের কৃত পুস্তক সকল।

বাঙ্গালাভাষার উন্নতিচেষ্টায় উল্লিখিত ইঙ্গরেজমহোদয়দিগের সমকালেই মহাত্মা রামমোহনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁদ্বারা বাঙ্গালাভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৬৯৬ শকে (১৭৭৪ খৃঃ অ) হুগলীজিলার অন্তর্বর্ত্তী খানাকুলকৃষ্ণনগরের সন্নিকৃষ্ট রাধানগরনামক গ্রামে ৺রামকান্তরায়ের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। রামমোহন শৈশবকালে গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় তৎকালে প্রচলিত রীতি অনুসারে বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পাটনানগরীতে গমনপূর্ব্বক পারসী ও আরবী অধ্যয়ন করেন। এই তরুণদশায় ভাষার অনুশীলনকালেই হিন্দুদিগের দেবদেবী প্রভৃতি সমস্তই কাল্পনিক বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। তৎপরে তিনি বারাণসীগমনপূর্ব্বক সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলনদ্বারা তাঁহার প্রথমোদ্ভূত হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার প্রতি বিদ্বেষভাব বিচ্ছিন্ন না হইয়া বরং দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিল। তদনুসারে তিনি পুরাণপ্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্ম যাহাতে সকলের মন হইতে অপনীত হয়, এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বচনানুসারে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা দেশমধ্যে প্রচারিত হয়, তদর্থ

যত্নবান হইলেন এবং তদুপায় স্বরূপ ১৬ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়েই "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক এক খানি বাঙ্গালাগ্রন্থ রচনা করিলেন। গ্রন্থদর্শনে তাঁহার পিতা বড়ই বিরক্ত ও কুপিত হইলেন; তাহাতে রামমোহন দুঃখিত হইয়া পিতৃভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষের নানাস্থানের প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালীর অবগতির জন্য অনেকদেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার অভিলাষে তিব্বৎদেশে গিয়া ৩ বৎসরকাল বাস করিলেন এবং তথা হইতে পুনর্ব্বার বাটী আসিয়া শাস্ত্রানুশীলন ও "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" প্রচারের চেষ্টাতেই সতত উদ্যত রহিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ক্রমাগত ৬।৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ইহাতেও বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন—এরূপ পারদর্শী যে, ইংরাজিভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অনু-শীলন করিয়া ক্রমে ক্রমে হিব্রু লাটিন গ্রীক ফরাসী প্রভৃতি সমুদয়ে ১০ টী প্রধান প্রধান ভাষায় লব্ধাধিকার হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি রঙ্গপুরের কালে-ক্টরের নিকট প্রথমে কেরাণীগিরি ও পরে দেওয়ানিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জনরব এই যে, ঐ স্থানে কর্ম্ম করিয়া তিনি বার্ষিক ১০,০০০ টাকা আয়ের এক জমীদারী ক্রয় করিতে পারিয়াছিলেন। রঙ্গপুর ভিন্ন ভাগলপুর এবং রামগড়েও তিনি কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃঃ অঃ) কলিকাতায় আসিয়া বাস

করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর হইয়াছিল। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি কেবল শাস্ত্রালোচনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারদ্বারা কুসংস্কারাবিষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকদিগকে উৎকৃষ্টপথে আনয়ন এই দুই কার্য্যের চেষ্টাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে দেশীয় বিদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিতদের সহিত তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিচার করিতে হইত। সেই সকল বিচার প্রায় বাচনিক হইত না—লিখিত হইত। এই জন্য তাঁহাকে ইংরাজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রের অনুবাদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিপক্ষেরাও পাষণ্ডপীড়ন ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল তাহা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, এমত নহে—রামমোহন রায়কে ধর্ম্মনাশকারী বলিয়া পথিমধ্যে প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ঐ প্রহারের ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষিবেষ্টিত হইয়া গমনাগমন করিতে হইত। কিন্তু তিনি এসমস্ত অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করিয়া নিজ উদ্দেশ্যসাধন বিষয়ে ক্ষণমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। যে সকল লোক তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তিনি "ধর্ম্মতলা ইউনিটেরিয়ান যন্ত্রালয়" নামক একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে নিজ মতানুসারী গ্রন্থ এবং বিপক্ষদিগের প্রদত্ত দূষণার উত্তর সকল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ তাঁহার কর্ত্তৃকই ১৭৫০ শকে [১৮২৮ খৃঃ অঃ] প্রথম স্থাপিত হয়। ১৭৫১ শকে [১৮২৯ খৃঃ অঃ] রাজবিধি দ্বারা হিন্দুজাতীয় স্ত্রীদিগের মৃতপতির সহিত সহমরণপ্রথা নিবারিত হয়। রামমোহন রায় তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায় রামমোহন রায়ের এই সকল কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে সাতিশয় চিন্তিত, ভীত ও কুপিত হইলেন এবং হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ "ধর্ম্মসভা" নামে এক সভা সংস্থাপন করিলেন। কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসভায় নানারূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। এক্ষণে সে ধর্ম্মসভা আর জীবিত নাই।

রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাত যাইবার জন্য বড়ই অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে দিল্লীর বাদসাহ তাঁহার নিজের কোন কার্য্যসাধনের উদ্দেশে তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক বিলাত পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন তদনুসারে তিনি ১৮৩০ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বরে অপর তিনজন দেশীয় লোক সমভিব্যাহারে বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় কোন হিন্দু বিলাতগমন করেন নাই। বিলাতে যাইবার সময়ে জাহাজে তিনি কেবল শাস্ত্রানুশীলন, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়াই পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তত্রত্য প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ ও বাক্পটুতা প্রভৃতির আধিক্য দেখিয়া তাঁহার পরম সমাদর ও মহা-

[illegible] করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াই ফ্রান্সে গমন করেন এবং তথা হইতেই রুগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যান এবং ঐ স্থানেই ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ব্রিষ্টল নগরের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার শব সমাহিত হইয়াছে।

আর্য্যজাতির শাসন প্রণালী।

ভারত ভূমির শ্রেষ্ঠ যেকালে সুশাসন ছিল তৎকালে ইহার যে দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইত, সর্ব্বদিগেই সুন্দর দৃশ্যে পরিপূর্ণ বোধ হইত। পুরাকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সন্তানগণ সমস্ত ধরাতলে অগ্রগণ্য ছিলেন। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন পাপের আধিক্য হইতে লাগিল অমনি তাহার নিবৃত্তিচেষ্টায় সকলেই তত্মনস্ক হইতেন।

ভিন্নদেশীয় ও আধুনিক সভ্যজাতির চক্ষে যাহা সামান্য দোষ বলিয়া গণ্য, ভারতবর্ষীয়দিগের নয়নপথে সেগুলি সে প্রকার সামান্য অপরাধ বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য নয়। ইহাঁদিগের নিকট অকার্য্য চিন্তা, কুকর্ম্ম, কুপরামর্শ, কুসঙ্গ কুব্যবহার মাত্রই দোষজনক। দোষ মাত্রই পাপোৎপত্তির মূল।

ইহাঁরা পাপে রত না হইতে পারেন এই কারণে শাস্ত্র-কারেরা আত্মা ও মনকে সকল কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ কহিয়াছেন। এই জাতির ধর্ম্মোপদেশকগণ মনুষ্যদিগকে শাস্ত্রের নিয়মাধীন করিয়া সংসার রক্ষার নিমিত্ত সমাজঘটিত যে সকল নিয়ম করিয়াছেন তাহার কতকগুলি অদ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

ইহাঁদিগের বিচারপ্রণালীর কতিপয় বিষয় পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, এক্ষণে ব্যবহার সংহিতার নিয়মানুসারে কোন

কার্য্য নিষিদ্ধ ও তদ্রূপ কার্য্য জ্ঞান পূর্ব্বক করিলে অথবা অজ্ঞানকৃত হইলে কিরূপ দোষ ঘটে ও সেই দোষ গুলি কি প্রকারে পাতকে পরিণত হয় এবং তাহার দণ্ডই বা কতদূর হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে দণ্ড-নীতিঘটিত বিষয়ের তাবৎ কার্য্য ও শাসন প্রণালী জানা যায়।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন বিচারপ্রণালীর বিষয় এক প্রকার বলা হইয়াছে। কিন্তু মকদ্দমার আপীলের কথা কিছু বলা হয় নাই। তাঁহাদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থ আপীলের কথা এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বিচারকালে যদি অভিযোক্তা অথবা প্রতিযোগী বা উভয় পক্ষে প্রমাণ প্রয়োগাদি পরিশুদ্ধরূপে গ্রহণ না হইয়া থাকে তাহা হইলে পুনর্বিচার হইতে পারে। প্রাড্বিবাকাদি কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত বিচারের প্রকৃত দোষপ্রদর্শন করিতে না পারিলে পুনর্বিচারস্থলে অভিযোগটী পুনর্নিষ্পাদনযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইত না। পুনর্বিচারদর্শনকালে রাজাকে বিচারাসনে উপস্থিত থাকিতে হইত। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে পুনর্বিচার স্থগিত থাকিত। প্রথমত ধর্ম্মাধিকরণের নিষ্পন্ন বিচারে দোষ দৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় ধর্ম্মাধিকরণের মতানুসারে নৃপতিকর্ত্তৃক প্রথম বিচারকের দণ্ডবিধান করা রীতি ছিল।

সুবিচার না করিলে রাজ দ্বার হইতে তিরস্কৃত দণ্ডিত লোক সমাজে ঘৃণিত এবং পরকালে নরকভাগী হইতে হইবে এই ভয়ে অধিকাংশ বিচারকই জ্ঞানগোচরে কদাপি

অবিচার করিতেন না। সেই হেতুই ইহাদিগের কৃত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে অধিকাংশ স্থলে প্রায় আপীল হইত না। সুতরাং পুনর্বিচারের কথা অল্প পরিমাণে দেখা যায়। আপীলের ভাগ অতি অল্প হইবার আরও একটি বিশেষ কারণ লিখিত হয়। সেটি এই—বাদী প্রতিবাদী কি প্রকার অবস্থার লোক, তাহাদিগের কেমন বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ ও কি বিষয়ক অভিযোগ, কি প্রকার সাক্ষী আছে, উহা অগ্রে পরীক্ষিত হইত। তৎপরে বিবেচনানুসারে সেটী বিচারযোগ্য কিনা জ্ঞান হইলে তাহার মীমাংসাজন্য বিচারাসনে অর্পিত হইত।

বিশেষতঃ বিবাদমাত্রই যে ধর্ম্মাধিকরণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইত তাহা নয়। কুল, ক্ষত্র, শ্রেণী, পরিবাররক্ষক পিতা, মাতা, এবং গুরু পুরোহিতাদি দ্বারা অনেক স্থলে বিবাদভঞ্জন করা রীতি ছিল বলিয়া অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতরূপে সুপদ্ধতি অনুসারে মীমাংসা হইয়া আসিত, তন্নিবন্ধন পুনর্বিচারের স্থল থাকিত না। আরও একটী বিশেষ কথা এই যে আর্য্যজাতির সমাজবন্ধনগ্রন্থি সমস্ত এমন দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে যে সত্যকালে যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহা ত্রেতাদি তিন যুগে নিষিদ্ধ ও তাদৃশ পাপজনক না হইলেও ইহাদিগের আবহমান কালের সংস্কার অনুসারে চিরকালই উহা নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাদিগের সমাজের একজন দোষ করিলে সমাজের সমস্ত লোককে দোষী ও পাপলিপ্ত জ্ঞান করা যায়।

ইঁহারা এমনি তেজস্বী ও ধার্ম্মিক ছিলেন যে মন্দ কর্ম্মমাত্র

ইহাঁদিগের ঘৃণার বিষয় ছিল কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক পাপচিন্তাকেও মনে স্থান দিতেন না। এমন এক কাল গিয়াছে যেকালে পাপী ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনেও ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির অধঃপতন ও নরকভোগ জ্ঞান হইত। এখন সেকাল কোথা গেল!—দ্বিতীয় যুগে পাপীর সংস্পর্শে মনুষ্যের পাপ লেখে; ক্রমে লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তৃতীয় যুগে পাপীর অন্নভক্ষণে পাপ-জননের বিধি হইল। চতুর্থ যুগে কুকর্ম্মকরণ দ্বারাই পাপোৎ-পত্তির বিধি থাকিল বটে—কিন্তু সংস্কারের গুণে, উপ-দেশের গুণে সমাজের প্রথানুসারে পাপীর সঙ্গে কথোপ-কথনাদি চতুর্ব্বিধ বিষয়ই সর্ব্বকালে আর্য্যজাতির নিকট পাপজনক বলিয়া নির্ণীত আছে। ভারতবর্ষীয়েরা পাপ কার্য্যে এরূপ ভয় করেন, পাপপঙ্ক ইঁহাদিগের শরীর ও মনকে এরূপ কলুষিত করে, যে ইঁহারা পাপক্রিয়ার নাম শুনিতেও ইচ্ছা করেন না। ইঁহাদিগের অন্তরাত্মাই ইঁহা-দিগের পাপ পুণ্যের সাক্ষী। সত্যকালে দেশমধ্যে কোন ব্যক্তি পাপপঙ্কে পতিত হইলে ধার্ম্মিকলোকেরা সে দেশ পরিত্যাগ করিতেন। ত্রেতাযুগে পতিত ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করিত সে গ্রামে ধার্ম্মিকগণ বাস করিতেন না। দ্বাপরে পাপী ব্যক্তি ও তৎসংস্পৃষ্ট লোকমাত্রকেই পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করা রীতি ছিল। কলিতে কথোপকথনে তাদৃশ দোষ না হউক কিন্তু পাপতপস্যে সপাপ আলাপ প্রদান ও অন্নভোজনে দোষ জন্মে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এস্থলে শাস্ত্রের বচন সঙ্কুচিত বলিতে হইবে। পাপীকে এই প্রকারে

ছলো কখন ধর্ম্মসমাজে দোষ প্রবেশ করিতে পারিত না। সুতরাং মৃষা অভিযোগ হইত না। সত্য অভিযোগের মধ্যে মীমাংসা হইত বলিয়া আপীলের স্থল থাকিত না।

অভিযোগের পূর্ব্বে যে প্রকার শপথ ও দিব্য করান হইত, তাহার নিয়মে এই জানা যায় যে অল্পকারণে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে পুত্রবান পুরুষ সবন্ধু ব্যক্তি ও পুত্রবতী নারীদিগকে পুত্রের মস্তকস্পর্শ অথবা প্রিয়ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইত। বৈশ্যজাতিকে শপথ করাইতে হইলে গোরু শস্য ও কাঞ্চন দ্বারা শপথ করানই প্রকৃত শিষ্টাচার। ক্ষত্রিয়জাতিকে শপথ করাইতে হইলে সত্য বল, মিথ্যা বলিও না, পাপ হইবে, এইরূপ কহিতে হয়। ব্রাহ্মণকে শপথ করাইবার সময় "কি জান যথার্থ বল" এইমাত্র বলিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। শূদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে সর্ব্বপ্রকার পাতক দ্বারা শপথ করান রীতি প্রচলিত ছিল।

দিব্য বিষয়ে—দেবতা, ব্রাহ্মণ, বাহন, অস্ত্র, গো, বৃক্ষ, বীজ ও সুবর্ণাদি দ্বারা দিব্য করান যায়। লোকসমাজে ও বিচারাসনের সম্মুখে এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মের অপলাপ পুরঃসর কোন ব্যক্তি অসত্য কহিতে সাহসী হন? যিনি মিথ্যা কথনে অথবা ছলে সাহসী হন তাহার আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা, মুখভঙ্গী, ও বিকৃত স্বরাদি দ্বারা তাঁহার মিথ্যাকথন প্রকাশ পায়। মিথ্যাবাদী জন সংসারে অতি অপদার্থ মধ্যে গণ্য হয়। মিথ্যা অভিযোগের

দণ্ড আছে, সে দণ্ড স্থলবিশেষে অতি ভয়ানক; বিশেষতঃ হিন্দুরাজগণ অল্প পাপেও গুরুদণ্ড করিতেন বলিয়া কেহ নিতান্ত সর্ব্বান্তিক পীড়া না পাইলে কাহারও বিরুদ্ধে বৃথা অভিযোগ করিত না।

শপথ ও দিব্য অদ্যাপি পল্লীগ্রামমাত্রে প্রচলিত আছে; উহা দ্বারা স্ত্রীলোকের কলহ, বালকগণের বিবাদ, ক্ষুদ্র-লোকের বৈষয়িক বাধ্য সম্বন্ধীয় বিবাদের মীমাংসা হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হয় না।

বিচারকার্য্য সুচারুরূপে, যথাযথরূপে, ও ন্যায়ানুসারী না হইলে পাপ জন্মে, ঐ পাপ চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া প্রথম পাদ পরিমিত অংশ রাজার স্কন্ধে পতিত হয়, দ্বিতীয় পাদ-পরিমিত ভাগ বিচারকের শরীর ও মনকে স্পর্শ করে; তৃতীয় পাদাংশ সাক্ষীকে আক্রমণ করে। চতুর্থ পাদ-পরিমাণাংশ অভিযোক্তাকে পাপী করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বিচারকার্য্যের দোষে প্রকৃত পাপকারীর স্কন্ধ হইতে পাপের বার আনা অংশ বিচারক নৃপতি ও সাক্ষীর স্কন্ধে পতিত হইতেছে। এই জ্ঞানটী সুদৃঢ় থাকাতেই সর্ব্বত্র সুবিচারই দেখা যাইত অবিচার প্রায়ই দেখা যাইত না।

গর্জ্জে কহিতে লাগিলেন, ওরে সৈনিকগণ ! তোদের রাজার পুত্র এখনকে সংবাদ দে, যে ব্যক্তি একবিংশতিবার ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে পিতৃলোকের তর্পণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া, ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছে, যাহার খরধার কুঠারে দুর্দ্দমসহস্রসম্পন্ন অর্জ্জুনের রুধিরপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, অদ্য সেই পরশুরামের করাল কুঠার দুর্বৃত্ত রামের শোণিতপানে লোলুপ হইয়াছে। অতএব কোথায় সেই নরাধম, শীঘ্র আমাকে দেখাইয়া দে।

সাগরের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি, মতিমান রামচন্দ্র দূর হইতে ভৃগুনন্দনকে রোষান্ধচিত্ত দেখিয়া কিছুমাত্র বিকলচিত্ত হইলেন না; বরং সহর্ষে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যিনি সমরক্ষেত্রে দুর্দ্দম হৈহয়পতিকে সংহার করিয়া জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন, যাঁহার নিকট অজেয় সেনানীও সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত হইয়াছিলেন, অদ্য সৌভাগ্যক্রমে সেই অসামান্য প্রতাপশালী ত্রিভুবনবিজয়ী ভগবান্ ভৃগুনন্দনকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলাম। আহা ! কি মুনি-বীর ব্রহ্মচারী প্রশান্ত গম্ভীর কলেবর ! ! দেখিলেই বোধ হয়, যেন ইনি সাক্ষাৎ তেজোরাশি, মূর্ত্তিমান তপঃপ্রভাব, এবং প্রচণ্ড বীররসের আশ্রয়। ইঁহার মস্তকে আপিঙ্গল জটাজাল, পৃষ্ঠদেশে তূণীর বামহস্তে ধনু, দক্ষিণকরে কুঠার, প্রকোষ্ঠে রৌদ্রাক্ষবলয়, স্কন্ধদেশে এণচর্ম্ম, বক্ষঃস্থলে অক্ষসূত্র, গলদেশে যজ্ঞোপবীত এবং কটিদেশে বল্কলবাস। বস্তুতঃ এরূপ সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর আকৃতি ত কখন নয়নগোচর হয় নাই। যাহা হউক, ইনি ব্রাহ্মণ স্বভাবসুলভ রোষপরবশ হইয়া, আমাকে

অন্বেষণ করিতেছেন, তখন আর অধিক বিলম্ব না করিয়া স্বয়ংই উঁহার নিকটে গমন করা যাউক। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মনস্তুরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং জামদগ্ন্যসমীপে উপস্থিত হইয়া, নতশিরে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

ভৃগুনন্দন, প্রিয়দর্শন রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া, স্মিতমুখে মনে মনে কহিলেন, পূর্ব্বে ইহার যেরূপ গুণানুবাদের কথা শুনিয়াছিলাম, ইহার আকার প্রকারও দেখিতেছি সেইরূপ। শরীর যেমন সামর্থ্যসম্পন্ন, তেমনি রমণীয়; কিন্তু এই যেটুকু অবমাননা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, আমার অন্তঃকরণে অনিবার্য্য ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়, কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য থাকে না। যাহা হউক, অদ্য দুরাত্মার শৌর্য্যসীমা স্বচক্ষে অবলোকন করা যাইবে।

মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃগুনন্দন রোমপাকষায়িত নেত্রে রামকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়শিশু! তুই সামান্য মৃগশিশু হইয়া, কিরূপে কেশরীর কেশাকর্ষণে উদ্যত হইয়াছিস্! যে চন্দ্রশেখরের শরাসন আকর্ষণ করিতে সুরাসুরমধ্যে কেহই সাহসী হয় না, তুই সামান্য ক্ষত্রিয়শিশু হইয়া সেই হরধনু ভগ্ন করিলি! অতএব তোর এ অপরাধ কখনই উপেক্ষণীয় নহে। এক্ষণে তুই আমার ক্ষত্রিয়কুলসংহারকারী কোপানলে অচিরে পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি। যদি সামর্থ্য থাকে, প্রতিবিধানের চেষ্টা কর।

পরশুরামের ঈদৃশ দর্পোদ্ধত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম প্রশান্তগম্ভীরস্বরে বিনয় করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি

রে পাপ! জীর্ণ হরধনু ভাঙ্গিয়া তোর এরূপ বিসদৃশ অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে! রে মূঢ়! সম্মুখে কালের করাল বদন দেখিয়াও কি দেখিতেছিস না? এই মুহূর্তেই তোর দর্প খর্ব করিতেছি; তুই অস্ত্রগ্রহণ কর। অথবা অস্ত্রগ্রহণের আবশ্যকতা নাই। তোর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, লোকে আমার অপযশ ঘোষণা করিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুই যদি আমার এই ধনুকে মৌর্ব্বী যোজনা করিতে পারিস, তাহা হইলে আমি তৃৎকৃত যাবতীয় অপরাধ মার্জ্জনা করিব। নতুবা আমার এই কুঠার তোর গলদেশ দ্বিখণ্ড করিবে।

পরশুরামের ঈদৃশ শ্রবণকটু বচনবিন্যাস শ্রবণে, রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র, পাদদলিত ভুজঙ্গের ন্যায়, [illegible] মাতঙ্গের ন্যায়, মেঘান্তরিত পতঙ্গের ন্যায়, প্রবল রোষপ্রকাশ পূর্ব্বক, অবলীলাক্রমে বামকরে ভার্গবধনু গ্রহণ করিয়া উহাতে গুণযোজনা করিলেন। অনন্তর অমোঘ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া, ভার্গবের স্বর্গগমনপথ অবরোধ করিলেন। জামদগ্ন্যের যাবতীয় দর্প একেবারে খর্ব্ব হইল। চতুর্দ্দিক হইতে সৈনিকগণ রামজয়শব্দে কোলাহল করিতে লাগিল। জামদগ্ন্য নবপরাভবে যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া, লজ্জাবনতমুখে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

যজুসংহিতার অব্যবহিত পরেই রামায়ণের উল্লেখ করা উচিত। এই গ্রন্থ বাল্মীকি ঋষির প্রণীত। ইহাতে সূর্য্যবংশাবতংশ মহারাজ রামচন্দ্রের চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বিঠুরনগরের সন্নিকটে বাল্মীকির আশ্রম ছিল। কোন সময়ে যে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় হয় না। যাহা হউক, তিনি যে মনুর অনেক পরে ও চন্দ্রগুপ্তের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মহাভারত আর এক খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে চন্দ্রবংশের অগ্রগণ্য কুরুপাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। রাজা যুধিষ্ঠিরের এক অব্দ প্রচলিত ছিল তদনুসারে ৪৯৬৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থনগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব পাণ্ডবদিগের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব; কারণ কোন গ্রন্থকার এক জন সমকালবর্ত্তী লোককে দেবতা বলিয়া বর্ণন করেন না এবং বর্ণন করিলেও জনসমাজে আদৃত হন না। এইরূপে ব্রাহ্মণেরা সমুদায় জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ একচেটিয়া করিয়া লইলেন, এবং শূদ্রজাতিকে একবারে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিলেন; যদিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার রহিল, কিন্তু উহা কেবল নামমাত্র অধিকার। ব্রাহ্মণদিগের এই আশঙ্কা ছিল, অপরে জ্ঞানলাভে অধিকারী হইলে তাহাদের প্রাধান্যের লোপ হইবেক। এ আশঙ্কা কোন মতে অমূলক নহে। কিন্তু আপাততঃ ইহার কোন কুফল লক্ষিত হইল না। ব্রাহ্মণেরা বহুকাল একাধিপত্য

করিয়া কাটাইলেন। পরিশেষে এক নূতন দিক হইতে বিপদ্ উপস্থিত হইল।

অধুনা যেখানে নেপালপ্রদেশ রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থলে কপিলবাস্তু নামে একটি ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাক্য সিংহ, যিনি পরে বুদ্ধনামে খ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি সেই কপিলবাস্তুর রাজপুত্র। রোগ, জরা ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় জগৎ সংসার ব্যাপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া, যৌবনাবস্থাতেই প্রিয়তমা যশোধরা ও পিতার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন, এবং নির্ব্বাণের পথ অনুসন্ধান করিবার জন্য কিছুকাল প্রগাঢ় সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। পরে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হইল, যে কেবল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ সত্য, সচ্চরিত্রতা, মৈত্রী, দয়াপ্রভৃতি ধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারাই জীব সংসারদুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে বলেন তপস্যা, বলিদান যাগ যজ্ঞ ও হোম পূজা দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, উহা অলীক; এবং তত্ত্বজ্ঞানীরা যে সিদ্ধান্ত করেন, কেবল জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়; উহা ভ্রমমাত্র। বুদ্ধ বলেন, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ মনুষ্যের দুঃখের কারণ, অতএব সমাধিবলে এই সকল রিপুকে নির্মূল করিতে পারিলেই শান্তি নামে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। বেদ যে মনুষ্যাকৃত নয় এবং সনাতনধর্ম্মের একমাত্র আকর, উহা তিনি স্বীকার করিতেন না। বুদ্ধদেব জাতিভেদ এককালে উঠাইয়া দিয়া এই নিয়ম করিলেন যে, শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। কেবল পুরোহিতেরা বিবাহ করিতে পারিবেন না; তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, সংসারাশ্রম হইতে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে তৎপদে মনোনীত করা হইবে।